"বাংলাদেশে সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ"—একটি সমীক্ষা

মোঃ কামারুজ্জামান

GIFT

425525

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
425525

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

425525

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশে সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ" – একটি সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক
মোঃ কামারুজ্জামান
এম.ফিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর ১৪৫/১৯৯৭-৯৮
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৩
ফোন ঃ ০১৯২৩৬৬২১০

425525

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ স্যারের নিকট সর্বান্ত করণে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা এবং আন্তরিক তত্ত্বাবধানের ফলে এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। কেবল গবেষণার জন্যই নয়, বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক এ্যাডভোকেসীর তুলনামূলক পর্যালোচনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান স্যারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক নাজমুন্নেছা মাহতাব, অধ্যাপক এম,এ. জিন্নাহ প্রমুখ এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছেন বলে তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও আন্তরিক সাহায্য করেছেন ড. হোসেইন শাহরিয়ার তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এ্যাডভোকেট ইতরাত আমিন আমাকে কাঠামোগত সাহায্য করেছেন তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ড. একেএম সাইফুল্লাহ'র কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যাকে সব সময়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় কাছে পেয়েছি।

425525

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ কামারুজ্জামান
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ তথ্য নির্দেশিকায় রয়েছে। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের নিজস্ব গবেষণার ফসল। এও প্রত্যয়ন করছি যে, এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

গবেষক
মোঃ কামারুজ্জামান
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য "বাংলাদেশে সোস্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ–একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে মোঃ কামারুজ্জামান কর্তৃক রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমার জানামতে লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

N.A. Kalimullah
11/11/2006

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Dept. of Public Administration
University of Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশে সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ"—একটি সমীক্ষা

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা

ঘোষণাপত্র

সারাংশ

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা কাঠামো

১.১ সূচনা ১

১.২ অনুসিদ্ধান্ত ৪

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৪

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৪

১.৬ তত্ত্বীয় কাঠামো ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

২.১ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কি? ৬

২.২ উদ্ভব ও বিকাশ ১১

(ক) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপর্ট ১১

(খ) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ১২

(গ) বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ১৩

তৃতীয় অধ্যায়

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৩.১ উপক্রমণিকা ১৪

৩.২ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী এবং সরকারী উদ্যোগ ১৫

৩.৩ বেসরকারী সংস্থা ও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ১৬

৩.৪ নৈতিকতা ও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ১৭

৩.৫ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও উন্নয়ন ৩৩

৩.৬ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কিছু প্রতিবন্ধকতা ৩৮

(ক) ধর্মান্ধতা ৩৮

(খ) অপসংস্কৃতি ৩৮

(গ) পুঁজিবাদ ৪১

(ঘ) জাতিসত্ত্বা ৫২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও গণমাধ্যম

৪.১ জনসংযোগ ও প্রচার ৫৬

৪.২ ঘরোয়া প্রকাশনা ৬০

৪.৩ সংবাদ মুদ্রণ ৬৩

৪.৪ ইলেকট্রোনিক্স গণমাধ্যম ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

৫.১ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ৮৭

৫.২ পারিবারিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ৮৭

৫.৩ সামাজিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ৮৮

৫.৪ রাজনৈতিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ৯০

৫.৫ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কয়েকটি কেস স্টাডি

৬.১ পলিথিন ৯২

৬.২ সুশাসন এ্যাডভোকেসী ১০২

- উপসংহার ১০৪
- গবেষণালব্ধ ফলাফল ১০৫
- তথ্যসূচী ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ

"বাংলাদেশে সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ"—একটি সমীক্ষা।

এ গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। এখানে বর্ণনামূলক আলোচনা ও তথ্যমূলক আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন হয়েছে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ।

সমাজ পরিবর্তনে বা সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক এ্যাডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সামাজিক বঞ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানোর ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক এ্যাডভোকেসীকে সংজ্ঞায়িত করা একটা কঠিন কাজ। এটা আপেক্ষিকও বটে। আভিধানিক অর্থে এ্যাডভোকেসী শব্দের অর্থ ওকালতি বা কারো পক্ষ সমর্থন করা। এ্যাডভোকেসীকে আমরা দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন– ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী এবং গোষ্ঠী বা সংগঠন কেন্দ্রীক যা কিনা সামাজিক এ্যাডভোকেসী হিসেবে পরিগণিত। ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী হল কোন সমস্যা সমাধানে যখন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে সমাধানে ব্রতী হয়। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে তার মায়ের কাছে কান্নার মাধ্যমে বিভিন্ন আবেদন উপস্থাপন করে। সামাজিক এ্যাডভোকেসী মূলতঃ থিওরিটিক্যাল ডিসিপ্লিন হিসেবে তুলনামূলকভাবে নতুন। এটি বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র মূল বক্তব্য হল– To build an equitable society with peace & justice.

এক কথায় বলা যায় যে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াই হল সামাজিক এ্যাডভোকেসী।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই-ই সামাজিক এ্যাডভোকেসী।

যেমন বলা হয় যেখানে good governance প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, সেখানে অসমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যেমন–দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বৈরশাসন ইত্যাদি।

তবে সামাজিক এ্যাডভোকেসীর কন্সেপটা ব্যাপক। এটা হতে পারে বিশ্বব্যাপী। অথবা কোন দেশ কিংবা অঞ্চল বা গোষ্ঠী ভিত্তিক। সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে অবশ্যই ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইস্যু ছাড়া সামাজিক এ্যাডভোকেসী বা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অকল্পনীয়।

সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র ভাষা হতে হবে স্পষ্ট। এখানে কোন অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা থাকবে না। এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হা কিংবা না দিয়ে উত্তর দিতে হবে। তবে কৌশলগত কারণে সবসময়েই হা অথবা না বলে উত্তর দিয়ে নীরব থাকতে পারেন। যেমন-যদি পরিকল্পনার কৌশলে হা বলে উত্তর দেয়া হয় তাহলে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তা মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে যেখানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা বা প্রতিষ্ঠা করা আজকের এই সময়ের জন্য একটি বড় 'চ্যালেঞ্জ'। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যই প্রয়োজন সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র।

বিশ্বে মানব সৃষ্টির গোড়া থেকেই মূলতঃ সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব হয়। সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশের ৩টি পর্যায় লক্ষ্যণীয়। ঐতিহাসিক, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দেশ ভিত্তিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা কাঠামো ঃ "বাংলাদেশে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ" –একটি সমীক্ষা। গবেষণাটি পরিচালনা করতে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। নিম্নে এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

১.১ সূচনা ঃ বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র অবদান অপরিসীম। আদিম যুগ থেকে মধ্য যুগ পেরিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয়েছে আজকের এই সভ্যযুগ। যার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রয়েছে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কৌশল ছিল ভিন্নতর। যুগে যুগে মানব সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ্যাডভোকেসী'র ধরণও পাল্টিয়েছে। এমনকি আদিম যুগে যখন মানুষের মধ্যে এতটুকু সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি বরং তারা শুধু লতাপাতা দিয়ে তাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান আবৃত করত এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে শিকারকার্য পরিচালনা করত তখনও তাদের মাঝে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- তারা যখন পাথর দিয়ে ঘষে আগুন সৃষ্টি করত তখনও তাদের মধ্যে এক ধরণের দলীয় কার্যক্রম বা টিমওয়ার্ক লক্ষ্য করা গেছে। তারা দেখল পাথরে ঘষা দিলেই যখন আগুনের সৃষ্টি হয় তখন তারা তা সংরক্ষণের জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হয়ে মুক্ত চিন্তার আশ্রয় নিল এবং ক্রমান্বয়ে তা সংরক্ষণে সমর্থ হল। এভাবে তারা যখন দেখল যে একা একা শিকার করলে ছোট ছোট জীব জন্তুই শিকার করা যায়–যা সবাই মিলে খাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বৃদ্ধদেরকেও তারা বসে বসে খাওয়াত যার পেছনে পরোক্ষভাবে কাজ করেছে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী। তাই তারা এক সময়ে সংগঠিত হয়ে বড় বড় জন্তু শিকার করত যা দিয়ে তাদের সকলের দিনের পর দিন চলে যেত। এভাবেই মানুষ সংগঠিত হতে শিখল সময়ের প্রয়োজনে। তাদের মধ্যে ছিল আবার ভিন্ন ভিন্ন গোত্র যাদের ছিল একেকজন দলনেতা। দল নেতার কথা সবাই মান্য করত। এটাও এক ধরনের সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ফল। অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী একটা সার্বজনীন ব্যাপার যা সেই আদিম যুগেও বিদ্যমান ছিল। যার প্রেক্ষিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তারা গোত্র প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ করত। বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে যখন সংঘাত ও যুদ্ধ বেঁধে যেত তখন গোত্র প্রধানদের হস্তক্ষেপে অনেক সময়েই মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে সকলেই রক্ষা পেত যা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'রই ফসল। এমনিভাবে আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বা মধ্যযুগে মানুষ যখন নানা অপকর্ম, গোড়ামি ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখনই আবির্ভাব হয় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কান্ডারী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর। আরব জাহানে যখন মানুষে মানুষে হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি এমনকি মেয়ে শিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলা হতো ঠিক তখনই মহান আল্লাহতা'লার নির্দেশে আবির্ভূত হলেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) শান্তির বাহক এবং একজন সোশ্যাল এ্যাডভোকেট হিসেবে। তিনি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের অন্যায় সম্পর্কে। যা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। এভাবেই এক সময়ে সকল অপরাধ বন্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একমাত্র সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কারণেই। আর এভাবেই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, যদিও আল্লাহতা'লা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন কিন্তু তিনিই আবার তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যাতে মানুষের পরিচিতি ও শনাক্তকরণ সহজ হয়। যেমন–এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলেও পরিবারের পার্থক্য বা ব্যক্তিত্বের দ্বারা তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। সবাই একই রক্তে একই দেহের গড়া। বাহ্যিক কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলগতভাবে সবাই সমান। তাই আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করি এবং অন্যায়কে প্রতিহত করি। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ আমাদের সৎসুন্দর মানসিকতা প্রদান করে সুন্দর কাজ করার তৌফিক দান করুন এটাই সকলের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

আর এটাই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী। আর ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন এবং হাদীসই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র দৃষ্টান্ত। এভাবেই বিভিন্ন যুগে ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী। যেমন-খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মেও তাদের ধর্মগুরুর আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুতরাং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী যুগে যুগে ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও অনানুষ্ঠানিকভাবে মানুষকে সভ্য ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সবসময়েই কাজ করে চলেছে। কখনো পরোক্ষ আবার কখনোবা প্রত্যক্ষভাবে। নিম্নের আলোচনার মাধ্যমে তা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সমাজে প্রথা হিসেবে চালু ছিল সতীদাহ। কোন হিন্দু রমণীর স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর উপরেও চাপিয়ে দেয়া হতো স্বামীর সাথে চিতায় পুড়িয়ে নিজেকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করা। যাকে বলা হতো সতীদাহ। এটা বন্ধের পেছনেও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার প্রবক্তা ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সকল বরেণ্য কবি ও লেখকের কাব্য ও লেখনির মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও বর্বরপ্রথা যেমন সতীদাহ সমাজ থেকে চিরতরে দূরীভূত হয়। তখন প্রতিষ্ঠান বলতে ব্যক্তিকেই বোঝাত। যেমন ইসলাম ধর্মে হুজুর পাক (সঃ) কেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হতো। তেমনিভাবে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ও একেকটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হতো।

আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছিলেন দক্ষিণ এশিয় উন্নয়নের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে এ কারণে যে, ধর্মীয় গোড়ামীর বেড়াজালে পরে উর্দু ও ফার্সি শিখতে তারা আগ্রহী বেশী হয়েছিল। আর এ সুযোগে হিন্দু তথা অন্যান্য ধর্মীয় লোকেরা বৃটিশ অধ্যুষিত এলাকায় ইংরেজী শেখার বদৌলতে একক আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আর ঠিক তখনই সৈয়দ আহমেদ এর এ্যাডভোকেসী'র ফলে মুসলমানেরা ইংরেজী শিখতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে নিজেদেরকে উন্নয়ন প্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়। আর তারই ধারাবাহিকতায় ভারত বর্ষ যখন বৃটিশ কলোনীমুক্ত হল ঠিক তখনই ধর্মীয় কারণে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংমিশ্রণে একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হিন্দুদের জন্য হয়েছিল ভারত রাষ্ট্র। এ সবের পেছনে কোন না কোনভাবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র অবদান অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় বাংলাভাষা নিয়ে আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষা কি হবে! উর্দু না বাংলা? বাঙ্গালীরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলল, ভাষার জন্য জীবন দিল অনেকে। কিন্তু প্রশাসনও কোন ছাড় না দিয়ে বরং আন্দোলন প্রতিহত করার কর্মসূচী নিল। এক পর্যায়ে সেই ভাষা আন্দোলনই ধীরে ধীরে ভৌগোলিক বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নিল। শুরু হলো দুর্বার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, রক্তপাত, যুদ্ধ। যার পেছনেও যৌক্তিকভাবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কাজ করেছে। যে প্রেরণা এক সময়ে বাংলা ভাষাভাষীদের দাবী শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলা-ই নয় বরং বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনেও সক্ষম হয়েছিল। দখল করে নিয়েছিল বিশ্ব মানচিত্রে "বাংলাদেশ" নামে একটি দেশের সুদৃঢ় অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সভ্যযুগে যেখানে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করছে। সচেতন হয়েছে নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে। ফিরে পেয়েছে তাদের আসল পরিচয় জাতিসত্ত্বা। ঠিক তখনই বিশ্বে চলছে পারমাণবিক বোমা তৈরির গবেষণা। যা আধুনিক বিশ্বের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। যার পরিণতি লক্ষ লক্ষ জীবনহানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তার প্রমাণ। জাপানের হিরোশিমার ধ্বংসস্তুপই প্রমাণ করে পারমাণবিক বোমা মানব সভ্যতার জন্য কতটা ভয়ংকর। তখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেখানকার সকল কীর্তি। যার রেশ বিশ্ববাসীকে আজও টানতে হচ্ছে। আজ এই সময়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিচ্ছে আর নয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ। আর নয় ধ্বংস। আর নয় মানুষ হত্যা। এই সুখ অনুভূতির পেছনেও শক্তভাবে অবদান রেখে চলেছে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী।

১.২ অনুসিদ্ধান্ত ঃ

সমাজ পরিবর্তনে বা সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সমতাপূর্ণ সমাজ গড়া সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও সামাজিক বঞ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানোও এর অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ উন্মোচন করা।

(খ) বাংলাদেশে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করা।

(গ) বাংলাদেশে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সামাজিক বঞ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানোর ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার জন্য সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

মূলতঃ এ গবেষণাটি বর্ণনামূলক গবেষণা। তথ্যমূলক ও বর্ণনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। আর এ জন্য প্রয়োজন হয়েছে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

– দুটো উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১। প্রাথমিক উৎস তথা সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ব্যাপক সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

২। দ্বিতীয় উৎস ঃ বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

* কেস স্টাডি বা ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমেও এ গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে।

১.৬ তত্ত্বীয় কাঠামো ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র থিওরিটিক্যাল ডিসিপ্লিন তুলনামূলকভাবে নতুন। এটা মূলতঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে এবং সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এ্যাডভোকেসীকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। পারসোনালাইজড এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী।

পারসোনালাইজড বা ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী হচ্ছে ব্যক্তির প্রয়োজনে যা অনানুষ্ঠানিকভাবে উদ্ভাবিত হয় এবং তার সমাধানও ঠিক একইভাবে পাওয়া যায়। যেমন–শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে কাঁদে। এর দ্বারা সে তার প্রয়োজনটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ কান্নার মাধ্যমে সে তার মায়ের কাছে খাদ্যের আবেদন করে এবং তার সমস্যার সমাধানে মা এগিয়ে আসেন। এভাবেই মানুষ যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তার আবেদনের ধরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এর মাধ্যমে উদ্ভব হতে থাকে সাংগঠনিক বা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কন্সেপটা ব্যাপক। এটা হতে পারে বিশ্বব্যাপী। অথবা কোন দেশব্যাপী কিংবা কোন অঞ্চল বা গোষ্ঠী ভিত্তিক। তবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে অবশ্যই ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইস্যুর উপরেই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অনেকটা নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কি ঃ

যুগের বিবর্তন ও সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীকে সংজ্ঞায়িত করাটা আপেক্ষিক। আভিধানিক অর্থে এ্যাডভোকেসী শব্দের অর্থ ওকালতি বা কারো পক্ষ সমর্থন করা। বিভিন্ন অভিধানে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন–

Advocacy : Some ones advocacy of a particular action or plan is their act of recommending it publicly, a formal use, I support your advocacy of free trade.....

The president's advocacy of higher taxes.

Advocacy is the way in which lawyers deal with cases in court; a formal use, sir peter would also like to see the current adversarial system of advocacy examined by the royal commission.

– In American English, an advocacy group or organization is one that tries to influence the decisions of a government or other authority, consumer advocacy groups are not so enthusiastic about freeing up the telephone companies.

* এ্যাডভোকেসীকে আমরা দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন–

১. ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী এবং

২. গোষ্ঠী/সংগঠন কেন্দ্রীক বা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী।

নিম্নের চিত্র থেকে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে একটা সাম্যক ধারণা লাভ করা যায়। যথা–

এ্যাডভোকেসী

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

সোশ্যাল
এ্যাডভোকেসীর উপাদান

Dhaka University Institutional Repository

* ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী হল এমন এ্যাডভোকেসী যে, কোন সমস্যা সমাধানে যখন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে সমাধানে ব্রতী হয়, তখন সেটাকে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী বলতে পারি। যেমন– শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখনই সে তার প্রকৃতিগত কারণে কান্না শুরু করে। এ থেকে সে তার আবেদন মায়ের কাছে উপস্থাপন করে। যাতে মা বুঝতে পারে যে শিশুর ক্ষুধা পেয়েছে অথবা অন্য কোন সমস্যা হয়েছে যা মা সমাধানে ব্রতী হন।

এভাবেই মানুষ যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তার আবেদনের ধরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এরই মাধ্যমে উদ্ভব হতে থাকে সাংগঠনিক বা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে যখন অন্ধকার যুগে মানুষ হিংসা, হানাহানি, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি কুকর্মে বিশ্বাসী ছিল। মেয়ে শিশুকে জন্মের পরই হত্যা করত। ঠিক তখনই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) দিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে সরল সহজ পথ প্রদর্শন করেন। এভাবেই তিনি একজন ব্যক্তি কেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী'র উদাহরণ। এরকম–শরৎচন্দ্র, শ্রি কৃষ্ন, রবি ঠাকুর এর উদাহরণ।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ঃ

আসলে থিওরিটিক্যাল ডিসিপ্লিন হিসেবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী তুলনামূলকভাবে নতুন। এটা মূলতঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অন্য কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মূল বক্তব্য হলো To build an equitable society with peace & justice. এক কথায় বলা যায় যে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াই হল সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী।

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই-ই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী।

যেমন বলা হয় যেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, সেখানে অসমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যেমন–দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বৈরশাসন ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বুঝা গেল যে, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র সাথে সুশাসন এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে সুশাসন, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা জরুরী।

আর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে কখনোই কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থ উদ্ধার হবে না।

মূলতঃ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কন্সেপটা ব্যাপক। এটা হতে পারে বিশ্বব্যাপী। অথবা কোন দেশ কিংবা অঞ্চল বা গোষ্ঠী ভিত্তিক। তবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে অবশ্যই ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, বুঝা গেল যে, ইস্যুর উপরেই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অনেকটা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বলা চলে ইস্যু ছাড়া সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অকল্পনীয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ্যাডভোকেসী কখনও হতে পারে ব্যক্তি নির্ভর সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে Threat for the advocacy process is the personalized form of advocacy.

আমরা দেখি যে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে যেমন শিশু অধিকার, শিশু শ্রম ইত্যাদি।

অথচ এক্ষেত্রে সব চাইতে বড় বাঁধাটাই হচ্ছে ব্যক্তি নির্ভর এ্যাডভোকেসী। কেননা একাধারে বলা হচ্ছে শিশু শ্রম বন্ধ করা প্রয়োজন আবার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বা শিশুদেরকে কাজে নিয়োজিত করার জন্য এ্যাডভোকেসী করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গার্মেন্টস সেক্টর, কলকারখানা প্রভৃতিতে শিশুশ্রম দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ভাষা হতে হবে স্পষ্ট। এখানে কোন অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা থাকবে না। এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাঁ কিংবা না দিয়ে উত্তর দিতে হবে। অর্থাৎ শিশু শ্রম বন্ধ করা প্রয়োজন কিনা। এক্ষেত্রে বন্ধ করা প্রয়োজন হলে সরাসরি বলতে হবে হাঁ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উত্তর দেয়ার কোন সুযোগ এখানে থাকবে না।

তবে কৌশলগত কারণে সবসময়ই হাঁ অথবা না বলে উত্তর দিয়ে নীরব থাকতে পারেন। যেমন-যদি পরিকল্পনার কৌশলে হাঁ বলে উত্তর দেয়া হয় তাহলে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তা মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। আর পক্ষান্তরে যদি না বলে উত্তর দেয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে বক্তার অবস্থান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, এক্ষেত্রে নীরবতা একটি সমর্থনযোগ্য এ্যাডভোকেসী কৌশল হতে পারে।

যেমন দেখা গেছে পলিথিন বিরোধী আন্দোলনে কখনো কখনো নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। ESDO নামের একটি সমাজবাদী সংগঠন যখন পরিবেশ দূষণ এ পলিথিন বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে এবং তৎকালীন (১৯৯৩ইং সনের) বিএনপি সরকার পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন ESDO সরকারের সিদ্ধান্তে হাঁ বা না কিছুই না বলে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। যার দ্বারা সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতা কোনটাই প্রতীয়মান হয়নি। ফলে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ESDO একটি পক্ষপাতহীন অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র গুরুত্ব ঃ

যেখানে সারা বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা বা প্রতিষ্ঠা করা আজকের এই সময়ের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যই প্রয়োজন সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী'র।

সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে কখনোই বলা যাবে না যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে, ইস্যুর একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য বা অবস্থান থাকতে পারে কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয়। কেননা একটি ইস্যুর ধারাবাহিকতা আরেকটি নতুন ইস্যুর জন্ম দেয়। তাই এ্যাডভোকেসী ও একটি অব্যাহত বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যা একটি ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করে এবং আর একটি নতুন ইস্যুতে যাত্রা শুরু করে। সুতরাং বলা যায় যে, Advocacy is a continuos process.

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পলিথিনের ক্ষেত্রে আমরা সফলতা লাভের কথা বলছি। কারণ, আইন করে এটা বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু আইন করে সাময়িকভাবে হয়ত বন্ধ করা সম্ভব। এটাকে অনেকদিন ধরে রাখতে হলে এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বেশি। এবং সাথে সাথে অর্জিত সাফল্যকে যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। যেমন ধরা যাক—পলিথিন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে সফল এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

মনে হতে পারে এই পর্যায়ে আন্দোলন শেষ হয়েছে এবং সাথে সাথে এ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়ারও সমাপ্তি ঘটেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলন শেষ হয়নি কারণ আইনের প্রয়োগের জন্য আন্দোলনে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। যে কোন প্রক্রিয়ায় বা আন্দোলনে কোন এক পর্যায়ে তা যদি বন্ধ করে দেয়া হয় বা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় তাহলে স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই/অর্থেই এ্যাডভোকেসী'র অপমৃত্যু ঘটে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কৌশল ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কৌশল নির্ধারণের জন্য ইস্যু নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইস্যু নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হলো–ইস্যুটা হতে হবে একক এবং জনস্বার্থ উপযোগী/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

এখানে আরেকটি দিক হল কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা গোষ্ঠীর নয় বরং এর পরিমন্ডল হওয়া উচিত জাতীয় ভিত্তিক, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক। অতএব, ইস্যু নির্ধারণও একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যদি আমরা ইস্যু হিসেবে পলিথিন কে নির্ধারণ করি সে ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেসী কৌশল হতে পারে অভীষ্ঠ লক্ষ্য গোষ্ঠী নির্ধারণ করা। বক্তব্য তৈরী এবং উপস্থাপন প্রক্রিয়াই কৌশল। অর্থাৎ একই বক্তব্য প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করাই হল কৌশল।

ক্যাম্পেইন/প্রচারণা হল– এ্যাডভোকেসী'র একটা টুলস। প্রচারণা কিভাবে হবে তার পদ্ধতিটাই হল কৌশল।

এখানে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য প্রচারের জন্য কোথাও গান, কোথাও বক্তব্য, কোথাও নাটক, কোথাও পোষ্টার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেখানে তা ব্যবহার করাই হল কৌশল।

সুশীল সমাজে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ভূমিকা ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ প্রতিনিধিগণ যদি প্রয়োজনে সঠিকভাবে কাজ না করে তবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে পলিথিনের ব্যাপারে, পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যাপারে, টু স্ট্রোক অটোরিক্সা তুলে দেয়া, ইত্যাদি সফল এ্যাডভোকেসী'র ফল। যা সুশীল সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তখনই সিভিল সোসাইটি উদ্ভব হতে শুরু করে। আর এই সিভিল সোসাইটিই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীতে রূপ নেয়। পরে যখন পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে শুরু করে ঠিক তখনই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব হতে শুরু করে এবং তা বিকশিত হতে থাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে।

(খ) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী আন্তর্জাতিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে মূলতঃ তখনই যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আধিপত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় এবং কমিউনিষ্ট শাসনের অবসান ঘটে। আর ঠিক এমনি মুহূর্তেই সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে শুরু করে তথাকথিত পুঁজিবাদ। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের কালো থাবায় নিষ্পেশিত হতে থাকে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লংঘনসহ সামাজিক ও জাতিগত বিভেদ বাড়তে শুরু করে। বর্ণভেদও বাড়তে থাকে অস্বাভাবিকভাবে। বৈষম্য আর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয় বিশ্বব্যাপী। একশ্রেণীর লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে অন্যদিকে কেউ আবার না খেয়ে, অর্ধাহারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। সারা বিশ্বে একটা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সামাজিক ন্যায় বিচারের বা সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী'ব। আর এভাবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী আন্তর্জাতিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে।

'৯০ এর দশকের প্রথম দিকেই ধণতন্ত্রের ধারক ও বাহক খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই শুরু হয় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র বা সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী'র।

এরপরই বিশ্বের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উপস্থিতি জোড়ালোভাবে লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) উদ্ভব ও বিকাশ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ঃ

আন্তর্জাতিক বিশ্বে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভের পর তা অন্যান্য উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে শুরু করে। বহু পথ পরিক্রমা পেরিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে ১৯৭১ সালে জায়গা করে নিয়েছে যে ছোট্ট দেশ তার নাম বাংলাদেশ। যেটি প্রথমে অনুন্নত এবং পরে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদায় আসীন হয়। আর মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ধণতন্ত্র বা পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যে যখন দেশীয় শিল্প হুমকির সম্মুখীন কিংবা বৈষম্যের ব্যাপক উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় দেশের সর্বত্র ঠিক তখনই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র তোড়জোড় ও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ বাংলাদেশে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র উপস্থিতি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা গেলেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি। অর্থাৎ ১৯৯২-৯৪ সালে সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৩.১ উপক্রমণিকা ঃ

বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীর ক্ষমতা বা নারীর অধিকার বলতে সমাজে সর্বস্তরে নারীরা সমভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং উন্নয়নে অবদান রাখবে এ ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলন বা মানুষকে বুঝিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করাও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কাজ। এভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়া, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, ত্রাসের রাজত্ব থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত করা– এ সকল ব্যাপারে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কাজে লাগতে পারে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে সবাইকে সচেতন করা এবং সুশীল সমাজকেও এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কাজ। আর উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান আছে বিধায় এখানেও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষের নৈতিক চরিত্রের অব্যাহত অবনতি, সরকারী বেসরকারী সংস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি এসবই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য একটা বড় বাঁধা হিসেবে নেপথ্যে কাজ করেছে। তাই বর্তমানে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানো। আশার কথা হল-অনেক বেসরকারী সংস্থাও সরকারের পাশাপাশি এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, নদী সংরক্ষণ, নৈতিকতা উন্নয়ন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত কাজে আগ্রহী করার জন্য জনগণকেও সচেতন করেছে। অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী করতে গিয়ে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতাও দৃশ্যমান হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হতে পারে ধর্মান্ধতা কিংবা পুঁজিবাদ ও জাতিসত্ত্বা অথবা হতে পারে সংস্কৃতিগত কারণে। একটি বিশেষ পর্যালোচনার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী এবং সরকারী উদ্যোগ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হত তাহলে হয়ত সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী'র এতটা প্রয়োজন হতনা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই সংবিধানের দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যাহার করে সরকার পরিচালনা করা হয়/পরিচালিত হয়। ফলে সমাজে অসমতা, বৈষম্য এবং সুশাসন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আর তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সোশ্যাল জাষ্টিস এ্যাডভোকেসী'র।

অর্থাৎ বলা যেতে পারে- রাষ্ট্র এবং সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং সংবিধানের সকল বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত এ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়া।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সমূহ এ্যাডভোকেসী'র ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রয়েছে পরিবেশ, নৌ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণরোধ, নদীভাঙ্গন ও নদী রক্ষা এবং যানবাহন চলাচল প্রভৃতি বিষয়ে কিছু নিয়মনীতি প্রনয়ন করা হয়েছে যা রূপান্তরে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র আওতাভূক্ত।

পরিবেশ দূষণরোধে পলিথিন বন্ধ করা এবং পলিথিন যে সমাজের জন্য, পরিবেশের জন্য তথা আপামর জনসাধারণের জন্য একটা খারাপ বস্তু তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। এবং তা বন্ধের ব্যাপারে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে টু ষ্ট্রোক থ্রি হুইলার/অটো রিকসাও যে ঢাকার পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ তাও প্রমাণিত হয়েছে। টু স্ট্রোক থ্রি-হুইলার ঢাকার বাতাসে শীশার পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করত এবং পরিবেশ দূষণ করতো। এটাও সরকার বন্ধ করে দিয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। অবৈধ দখল থেকে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীর রক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইনের পাশাপাশি সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীও সরকারী উদ্যোগের সাথে একাত্ব হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যখন পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করছিল। জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, পলিথিন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ঠিক তখনই সরকার আইন করে তা বন্ধ করে দেয় এবং তারাও জনগণকে পরিবেশ বান্ধব বস্তু ব্যবহারের জন্য এ্যাডভোকেসী করতে থাকে এবং সফলতা লাভ করে।

অতএব এব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে এ্যাডভোকেসী করা প্রয়োজন আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

৩.৩ বেসরকারী সংস্থা ও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ঃ

এখানে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা বলতে সাধারণ অর্থে বুঝানো হচ্ছে এনজিওসমূহকে। এক কথায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে NGO সেক্টরে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান দৃশ্যমান হচ্ছে। যেমন-

লাভজনক এবং অলাভজনক।

তবে কোম্পানীর মধ্যেও দু ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন-

একটু ব্যাপক ভাবে আলোচনা করলে আভিধানিক অর্থে এনজিও বলতে বুঝায় সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-ক্লাব, কোম্পানী, সেবামূলক সংগঠন ইত্যাদি।

সেবামূলক সংগঠনগুলো সরকারের দুটি বিশেষ সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। অপর দিকে কোম্পানী নিবন্ধন করা হয় জয়েন্ট স্টক রেজিষ্ট্রার এর অফিস থেকে অর্থাৎ সোশ্যাল সার্ভিস এ্যাকট-এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এবং ফরেন ডোনেশান রেগুলেশন এ্যাকট-এর আওতায় NGO Affairs Bureau কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয়।

ব্যাখ্যাঃ কোম্পনী এ্যাক্টের আওতায় নিবন্ধনকৃত সংগঠন দুই ধরনের নিবন্ধন পেয়ে থাকে। এক-লাভজনক ও দুই—অলাভজনক।

তবে সোশ্যাল সার্ভিস এ্যাক্টে এবং ফরেন ডোনেশান এ্যাক্টের আওতায় নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান গুলো শুধুমাত্র অলাভজনক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নিবন্ধিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে-সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে বেশকিছু সংখ্যক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদানের পাশাপাশি আয়বর্ধক লাভজনক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কোম্পানী এ্যাক্টের আওতায় নিবন্ধন করলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে বেসরকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দুটো ধারা অব্যাহত রয়েছে। একটি লাভজনক অন্যটি অলাভজনক। তবে সম্প্রতি যে ধারাটি সংযুক্ত হয়েছে তাহল সেবা এবং লাভের সংমিশ্রণে সেবা প্রদানের পাশাপাশি আয় বর্ধন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। যদিও এ ব্যাপারে সরকারের তেমন কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা নিয়ম-কানুন বা নিয়ম পদ্ধতি নেই।

বেসরকারী সংস্থার ধরণ ও কর্মপদ্ধতি বহুবিধ বিধায় এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ও নামকরণ পদ্ধতির ব্যাখ্যাসহ কর্মপ্রক্রিয়া তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

এক্ষেত্রেও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৪ নৈতিকতা ও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ঃ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই সুপ্রাচীনকালেও মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক ধারণা প্রচলিত ছিল, যদিও সেদিনের ধ্যান-ধারণা ও নৈতিক চেতনা ছিল নিতান্তই অপ্রকট ও অপরিস্ফুট। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের সাথে নৈতিকতার ধারণা ক্রমবিকশিত হতে থাকে। ইংরেজি এথিক্স ও মর‍্যাল ফিলসফি কথা দুটির উৎপত্তি যথাক্রমে এথস ও মস, এই দুটি ল্যাটিন মূল ধাতু থেকে। উভয়ের অর্থই প্রথা (custom) বা প্রচলিত রীতি নীতি। মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নে মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবুদ্ধির পরিসর ছিল খুবই সীমিত। তখন তাদের কর্ম ও আচরণের মূল্য বিচারের কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রামাণিক মানদণ্ড ছিল না বললেই চলে। এমতাবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের জরুরী প্রয়োজন এবং সামাজিক শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের নির্ভর করতে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু রীতিনীতি ও প্রথার প্রচলনের ওপর। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের যাছ-বিচারের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষেরা যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, সেগুলোকেই তারা গ্রহণ করতো নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

যাই হোক, নৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয় ভারত, চীন, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে। এছাড়া প্রাচীন বাইবেল ও অন্যান্য আদি ধর্মশাস্ত্র ও নবী-পয়গম্বরদের ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের মূলেও ছিল এক সুস্পষ্ট নৈতিক তাৎপর্য। তবে নীতিবিদ্যার সুনির্দিষ্ট চর্চা শুরু হয় প্রাচীন গ্রিস দেশে। আদি গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে হিরাক্লিটাস (আনুমানিক ৫৩০-৪৭০ খ্রি. পূ.) ও ডেমোক্রিটাস (আনু. ৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ) এর চিন্তায় যথাক্রমে বিধিবাদী ও সুখবাদী মতের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, এবং অনেকের মতে এ দু'জনের মতের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বিকাশলাভ করে যথাক্রমে স্টোয়িকবাদ ও এপিকিউরীয়বাদ। হিরাক্লিটাস প্রজ্ঞার (reason) বিধান মেনে চলার এবং ডেমোক্রিটাস সুখানুসন্ধানের পরামর্শ দেন।

নৈতিকতা ও আপেক্ষিকতা

পারমেনাইডিস ও পিথাগোরাস নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে সামান্য হলেও আলোচনা করেন এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের ন্যায় তাঁরাও ফিলসফি বলতে সুষ্ঠু চিন্তা ও উত্তম জীবন পরিচালনার উপায়ানুসন্ধানকে বুঝাতেন। তবে প্রাকৃতিক ব্যাপারাদির প্রাধান্যের স্থলে মানবিক ও নৈতিক সমস্যাবলীকে সরাসরি সামনে নিয়ে আসেন সোফিস্ট নামে দার্শনিক গোষ্ঠী (আনু. ৪৫০-৪০০ খ্রি. পূ.)। এ গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন প্রোটাগোরাস। তাঁর মতে, ব্যক্তি মানুষ নিজেই সত্যের পরিমাপক ও নির্ধারক। সব মানুষের গ্রহণযোগ্য বিশ্বজনীন নীতি বলে কিছু নেই। অর্থাৎ সত্যতা ও নৈতিকতা পুরোপুরি একটি আপেক্ষিক ও ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার। আমার কাছে যখন যা সত্য ও ভাল বলে প্রতীয়মান হবে, তখন তা-ই আমার জন্য সত্য। এর বাইরে কোনো সার্বজনীন সত্য ও ভাল বলে কিছু আছে কিনা, তা আমি জানি না। অন্যের সত্যের সঙ্গে আমার সত্যকে তুলনা করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং অন্যের সত্যের চেয়ে আমার সত্যকে বেশি সত্য বলার অধিকারও আমার নেই। ব্যক্তিমাত্রই সৎ অসৎ ও সত্যমিথ্যার মানদণ্ড। ব্যক্তিমনের বাইরে যেমন সত্য নির্ণয়ের কোনো পৃথক মানদণ্ড নেই, তেমনি মুহূর্তের উর্ধ্বেও সত্য পরিমাপের কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নেই। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত পরিবর্তনশীল সত্তা ব্যতীত প্রজ্ঞার সাহায্যে আবিষ্কার করা যায় এমন কোনো ধ্রুব সত্য বা সত্তার অস্তিত্ব নেই। প্রোটাগোরাসের মতে হিরাক্লিটাসের পরিবর্তনবাদের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। সবকিছুই যদি বদলায়, তা হলে প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষিত বস্তু— এ দুটিও নিরন্তর বদলাচ্ছে। এ দুয়ের মধ্যে ক্ষণিকের সংযোগ থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

সংবেদনের উৎপত্তি। কিন্তু যে মুহূর্তে ইন্দ্রিয় ও বস্তুর এই সংযোগের পরিসমাপ্তি ঘটে, ঠিক তখনই প্রত্যক্ষকারীর ইন্দ্রিয় থেকে সংবেদন তিরোহিত হয়, এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষিত গুণটিও প্রত্যক্ষিত বস্তুকে ত্যাগ করে। পরবর্তী মুহূর্তে প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষিত বস্তু—এ দুয়ের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং একথা বলা মোটেও অসঙ্গত নয় যে, ব্যক্তিমনে যে মুহূর্তে সংবেদন সংঘটিত হয়, শুধু সেই মুহূর্তেই তা ব্যক্তির জন্য সত্য। এ ছাড়া সার্বজনীন নিত্যসত্য বলে কিছু নেই। প্রোটাগোরাসের সংশয়বাদের জোর সমর্থন আসে অপর এক সোফিষ্ট জর্জিয়াস (৪৮৩-৩৯৫ খ্রি. পূ.) থেকে। 'অস্তিত্বহীন প্রকৃতি' (On Nature or the Non-existent) শীর্ষক এক গ্রন্থে তিনি পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়—অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অন্য কোনো সত্তাকে বুদ্ধির মাধ্যমে আবিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন।

নৈতিকতার প্রশ্নে প্রোটাগোরাস ও জর্জিয়াসের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে তাত্ত্বিক ধ্যান-অনুধ্যানের পক্ষেই ধ্বংসাত্মক ছিল তা-ই নয়, নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব ছিল মারাত্মক। যেমন, ব্যক্তি মানুষ নিজেই যদি সব জিনিসের মানদণ্ড হয়ে থাকে, তা হলে তাকেই সত্য-মিথ্যা শুভ-অশুভের নির্ধারক ও বিচারক বলে স্বীকার করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্য কারো তার সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক করা নিরর্থক। এ মতে, একজন অন্যজনের ওপর কোনো নৈতিক নিয়ম চাপিয়ে দিতে পারে না; কেননা সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক নিয়ম কিংবা ঠিক-বেঠিক বা ন্যায়-অন্যায়ের পরিমাপের কোনো সর্বজনীন ও সার্বভৌম মানদণ্ড নেই।

অনুরূপ নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন কেলিক্লিস। তিনিও প্রচলিত নৈতিক রীতিনীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, দুর্বলদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই সবলরা অধিকাংশ আইন প্রণয়ন করেছেন। তাতে আইনের প্রাকৃতিক ধর্ম ও গতি ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিধানকে একটি অভিজাত শক্তি বলে অভিহিত করা যায়; কেননা এ বিধান সবলদের পক্ষে সহায়ক ও দুর্বলদের স্বার্থের পরিপন্থী। কেলিক্লিস এমন এক নৈতিক সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন যিনি নৈতিক বিধি-নিষেধ দ্বারা পরিচালিত না হয়েই মানব জাতির সংস্কার সাধনের প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হবেন।

কেলিক্লিসের চেয়েও উগ্রপন্থী ছিলেন সোফিষ্ট থ্র্যাসিম্যাকাস। প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে তাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তা আমাদের আধুনিক কালের ম্যাকিয়াভেলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেলিক্লিস প্রাকৃতিক নৈতিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য প্রকৃতির মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

থ্র্যাসিম্যাকাস কেলিক্লিসের সঙ্গে একমত নন। ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি শক্তির সমর্থন করেন। তাঁর মতে, শক্তির সমর্থন না পেলে সুবিচার বা ন্যায়পরায়ণতা টিকে থাকতে পারে না। জোর যার মুল্লুক তার এবং পৃথিবী বলবানদের দ্বারা শাসিত হোক—এই ছিল তাঁর বাসনা।

তবে সবলদের দুর্বলদের ওপর কর্তৃত্ব করার, কিংবা দুর্বলদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগের কোনো প্রাকৃতিক অধিকার আছে বলে তিনি স্বীকার করেননি। মানুষের উত্থান-পতন নিতান্তই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে না। সত্যমিথ্যা, শুভাশুভ, ন্যায়-অন্যায়—এ সবের পার্থক্য নির্দেশ করবেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা; আর তাও তাঁরা করবেন তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী, কোনো সার্বিক নৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে নয়। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের সুখ-সুবিধাই নৈতিক বিধি-নিয়মের ভিত্তি। সুতরাং আমরা যাকে ন্যায় বলি তা আসলে বলবানদের স্বার্থ ও সুবিধারই নামান্তর।

সোফিষ্ট দর্শনের আলোচনা থেকে এটুকু এখন পরিষ্কার যে, জ্ঞান সত্য নীতি ইত্যাদি কোনোটির ক্ষেত্রেই সোফিষ্টরা সর্বজনীন মানদণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা যে মানদণ্ডের কথা বলেছেন, তা ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতি সাপেক্ষ, বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত সার্বিক কিছু নয়। আর তা নয় বলেই সেদিনের মানুষ সোফিষ্টদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিক মানদণ্ডের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে; জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার স্থলে কী করে সার্বিকতা প্রবর্তন করা যায়? কী করেই বা জ্ঞান ও নৈতিকতার বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বজনীন মানদণ্ড আবিষ্কার করা যায়? সক্রেটিস ও প্লেটো এ লক্ষ্যেই তাঁদের দার্শনিক চিন্তা নিবেদন করেন।

এথিক্স ও মর‍্যালিটি

নৈতিক চেতনা বিকাশের ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও পাশ্চাত্য জগতে এথিক্স বা নীতিবিদ্যার সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ আলোচনা শুরু হয় সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটলের উদ্যোগে। তাঁদের মতে, যে সব কর্ম ও আচরণ মানুষকে ভাল বা খারাপ প্রতিপন্ন করে, সেগুলো প্রাকৃতিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মতো কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা ইচ্ছাকৃত কাজ। এ ঐচ্ছিক আচরণকেই তাঁরা এথস (ethos) বলে অভিহিত করেন; আর তাঁদের এই শিক্ষা থেকেই প্রচলন শুরু হয় এথিকস কথাটির। পরবর্তী পর্যায়ে সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রি.পূ.) সেনেকা (৩ খ্রি. পূ. ৬৫ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.) প্রমুখ রোমান দার্শনিক মস (mos) কথাটিকে ব্যবহার করেন প্রথাগত আচরণের অর্থে; আর এ থেকেই উৎপন্ন হয় মর‍্যালস (morals), মর‍্যালিটি প্রভৃতি শব্দের। এ অর্থেই নীতিবিজ্ঞানকে দেখা হয়ে থাকে মানুষের কার্যকলাপের দোষ-গুণ বিচারের একটি প্রণালীবদ্ধ শাস্ত্র হিসেবে।

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? শোভন ও অশোভন আচরণের মধ্যে পার্থক্য কী? মানুষের কোন কোন কাজ যথার্থই ভাল ও মানবোচিত, আর কোন কোনটি অমানবিক ও অনুচিত?— এ জাতীয় মূল্যবোধক প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধান করা হয় নীতিবিজ্ঞানে। এসব প্রশ্ন মানুষের স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য খুব জরুরী না হলেও মহৎ মানবোচিত জীবনের জন্য অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে যে, আমরা এমন এক জগতে বাস করি যেখানে আমাদের কেবল কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই চলে না, বরং ভাল-মন্দ, যথোচিত ও অনুচিত কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। একজন অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার কিংবা একটি মোটর গাড়ি চালাবার যেমন সঠিক ও বেঠিক উপায় রয়েছে, তেমনি আমাদের জীবনের মূল্য বা সদ্‌গুণ অর্জনেরও সঠিক ও বেঠিক পথ রয়েছে। আর নীতিবিদ্যার মূল কাজটাই হলো একটি কাজ অন্য একটি কাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কেন, এবং নিকৃষ্টটিকে বাদ দিয়ে উৎকৃষ্টটিকে গ্রহণ করা উচিত কেন, তা যথাযথ যুক্তি দিয়ে বলে দেয়া। আর এ জন্যই নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণকে বিচার করে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনটি হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোনো একজন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো একটি পেশায় অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক আচার-আচরণে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ অনুশীলনে তিনি একেবারেই উদাসীণ কিংবা অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় নীতিবিজ্ঞানের কাজ হবে ওই মানুষটির সামনে মহৎ জীবনের একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরা এবং দয়া মায়া প্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণের আলোকে তাকে সঠিক জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

নৈতিকতা ও ব্যবহারিক জীবন

নীতিবিজ্ঞান (ethics), নৈতিকতা তথা দর্শন ও মানবজীবনের সম্পর্ক নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে, এমনকি খোদ বিদগ্ধ পণ্ডিতজনদের মধ্যেও গুরুতর বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। তাদের কারে কারো মতে দর্শন বলি, সুনীতি বলি, আর সৌন্দর্য্যের কথাই বলি— এসবই নিছক

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বকথা, এবং সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-বঞ্চনা ও ক্ষোভ বিক্ষোভের বাস্তবজীবনের সঙ্গে এদের কোনো যোগ নেই। সুতরাং এ নিয়ে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের মতো একটি দুর্ভাগা দরিদ্র দেশে আলোচনার প্রয়োজন নেই, থাকতেই পারে না। একই যুক্তিতে আরো বলা হয় আজ আমাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তা তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা (metaphysics) নয়, বরং অর্থনীতি ও প্রযুক্তির অবাধ বিকাশসহ এমন কিছু সময়োপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যা কিনা সহায়ক হতে পারে এ দেশের অগণিত জনমানুষের প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানে এবং সুখী স্বাচ্ছন্দ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে। আর এক্ষেত্রেও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনীতি ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজন যে অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য। এবং এ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করার কিংবা বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার এতটুকু অবকাশ নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে, অর্থনীতি, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি জরুরী বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন ও সুনীতি (morality) চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই? বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জয়-জয়কার ও দর্শন বিতৃষ্ণার এ পরিবেশে দর্শন, নীতিবিজ্ঞান তথা মানববিদ্যার স্বরূপ ও গুরুত্ব এবং বিশেষ করে দার্শনিক ও নীতিবিদদের সামাজিক, রাজনৈতিক নান্দনিক ভূমিকা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা আজ সময়ের এক বড় প্রয়োজন। আর এ কাজটিই আমরা করতে চাই এখানে দর্শনের স্বরূপ ও মহৎপ্রাণ দার্শনিকদের জীবনচরিত সম্পর্কে কিছু কথা বলার মাধ্যমে।

দর্শনের স্বরূপ নিয়ে বহু মত ও পাল্টা-মত থাকলেও একটি বিষয়ে দার্শনিকদের প্রায় সবাই একমত। আর সেটি হলো এই যে, দর্শন মানে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি যুক্তিবাদী বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের বিভিন্ন দিক, সমস্যা ও সম্ভাবনাকে যুক্তির আলোকে তলিয়ে দেখা, যে কোনো বিষয়কে উদার ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাই দর্শনের মূল কাজ। যিনি সত্যিকার অর্থে একজন দার্শনিক, তিনি কখনো ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি কোনো কর্তৃপক্ষের আচার-অনুশাসন কিংবা আদেশ নির্দেশ দ্বারা অন্ধভাবে চালিত হন না, বরং নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হন। এ কথা ঠিক যে, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতির বাছ-বিচারের নির্দেশনা ধর্মশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বাধীন সন্ধানী মন ধর্মনির্দেশিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। প্রাচীন ধর্মীয় নির্দেশাবলী আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে কতটুকু প্রযোজ্য-এ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েও বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ধর্মবেত্তা ও ধার্মিক ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যেও ধর্মীয় নির্দেশাবলীর প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এ পরিস্থিতিতে স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একমাত্র দর্শনেই সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও সমীক্ষার অবকাশ রয়েছে।

যেমন ধরা যাক বিজ্ঞানের কথা। বিজ্ঞানমাত্রই প্রকৃতির কোনো একটি বিশেষ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে; কিন্তু দর্শনের দৃষ্টি প্রকৃতির কোনো একটি বিশেষ দিকের প্রতি নয়, জগতের সামগ্রিক কাঠামো ও রূপ-স্বরূপের প্রতি নিবদ্ধ। দ্বিতীয়, বিজ্ঞান তথ্যজ্ঞাপক; বিজ্ঞানীর কাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার। পক্ষান্তরে দর্শনের কাজ কোনো কিছু আবিষ্কার নয়, প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ও যৌক্তিকতার বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। বিজ্ঞানী চান প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে তথ্য ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে, আর দার্শনিক চান ধারণা ও বিশ্বাসের মূল্য নিরূপণ ও অবধারণ করতে। যেমন, বিজ্ঞান পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এর ব্যবহার সংক্রান্ত সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার মীমাংসা দেয়নি, দেয়া বিজ্ঞানের কাজও নয়। বিজ্ঞানের কাজ তথ্য আবিষ্কারে, উদ্দেশ্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগে মানুষকে সাহায্য করা; কিন্তু শুধু তথ্য আবিষ্কার কিংবা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নির্দেশই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। একাধিক বিকল্প উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনটির নির্বাচন ও প্রয়োগ নৈতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয়, তা জানতেও মানুষ সমানভাবে আগ্রহী। মূল্যবোধ সংক্রান্ত এ ধরনের জিজ্ঞাসার সদুত্তর অনুসন্ধান করা হয় কেবল দর্শনে।

দর্শন ও দার্শনিক চরিতমানস

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারেঃ জীবনকে পরীক্ষা করার ওপর দার্শনিক এই যে গুরুত্ব আরোপ করেন, তার প্রয়োজন কী? উত্তরে বলা যায় যে কোনো বিষয়কে নির্ভুলভাবে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যাবশ্যক। না বুঝে স্রেফ আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিংবা নিছক বিশ্বাসের ওপর ভর করে যে জীবন যাপন করা হয়, তা আর যাই হোক যথার্থ মানবোচিত জীবন নয়। কারণ, এহেন জীবনে একদিকে যেমন চেতনার, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতার অভাব রয়েছে। এ জীবন অর্ধচেতন, সুতরাং নিম্নমানের জীবন। আমরা কখন কী করছি, এবং কেনই বা তা করছি, তা পুরোপুরি জানার জন্য জ্ঞানের সঙ্গে উপলব্ধির একটা সংযোগ থাকা দরকার। যথার্থ অর্থে মানুষ হতে হলে আমাদের অবশ্যই জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্বাচন এবং নির্বাচিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি সঠিক বলে বিবেচিত হলো কিনা এসব মূল্যবোধক প্রশ্নের উত্তরও আমাদের জানা দরকার; কারণ পরীক্ষিত জীবনযাপনের জন্য এসব প্রশ্নের সদুত্তর জানা খুবই প্রয়োজন।

দর্শনের কোনো সর্বজনবিদিত অভিন্ন সংজ্ঞা না থাকলেও আমরা প্রশ্ন করতে পারি; যথার্থ দার্শনিক মনোবৃত্তি কী হওয়া উচিত? এ প্রসঙ্গে আমরা অনেককে প্রশংসার সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে দেখি। আমরা যখনই কাউকে দুঃখ দুর্দশা দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে দেখি, তখন অবলীলাক্রমে বলি তিনি যেকোনো বিপদ-আপদকে দার্শনিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন। এখানে দার্শনিকতা বলতে সাহসিকতার সঙ্গে বাস্তবতা মোকাবিলার, কঠিন জিনিসকে সহজভাবে গ্রহণ করার এবং যে কোনো অবস্থায় প্রশান্তচিত্তে কাজ করার চারিত্রিক গুণের কথা বলা হয়। আসলে একজন দার্শনিকের মনোবৃত্তি এরকমই হওয়া উচিত। বিশিষ্ট রোমান দার্শনিক বিথিয়াস (৪৭০–৫২৬) কে যখন এক ভিত্তিহীন অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি উদার ও মহান জীবনের ওপর দর্শনের সান্ত্বনা নামক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ওই গ্রন্থে তাঁর একটি কথা ছিল এই যে, কোনো দুঃখ দুর্দশাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং জ্ঞান, সত্য ও সুনীতি চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে যথার্থ মানবোচিত জীবন যাপনের সচেতন প্রয়াসই দর্শন। আর যাঁরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখেও সাহসিকতার সঙ্গে এবং প্রশান্ত চিত্তে সেই জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যান, কোনো প্ররোচনা প্রলোভনেই পিছপা হন না, তাঁরাই যথার্থ দার্শনিক।

দর্শনের স্বরূপ এবং দার্শনিকদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানারকম মত ও পাল্টা মত লক্ষ্য করা যায় খোদ দার্শনিকদেরই মধ্যে। কিন্তু আপন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং মৃত্যুদণ্ডকে সামনে রেখে দর্শনের স্বরূপ ও দার্শনিকদের মনোবৃত্তি ও জীবনাচরণ সম্পর্কে বিথিয়াস এই যে কথাগুলো বললেন, তাদের মর্মার্থ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। যে জগতে সাহস ও সততার বড় অভাব, যেখানে নীতিবান মানুষের সান্ত্বনা বড় প্রয়োজন, সে জগতে সাহস, সততা ও সান্ত্বনাই দার্শনিকদের জন্য দর্শনের এক মস্তবড় উপহার। বস্তুত, সেকালের সক্রেটিস বিথিয়াস প্রমূখ থেকে আমাদের কালের রাসেল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অনেকেই বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে একথা প্রমাণ করে গেছেন যে, একজন দার্শনিকের কাছে মানবিক মূল্যবোধ ও সুনীতির চেয়ে বেশি প্রিয় আর কিছু নেই। দার্শনিক মাত্রই সুস্থ চিন্তাকে গ্রহণ করেন একটি ব্রত হিসেবে; আর

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যই একে তিনি পরিহার করতে পারেন না কোনো প্রলোভন, প্ররোচনা কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে। জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও দার্শনিক অব্যাহত রাখেন ন্যায়, সত্য, শুভ ও সুন্দরের অনুশীলনকে, নানা রকম প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে সমুন্নত রাখেন মানবিক মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধকে। নৈতিকতার সঙ্গে দর্শন ও দার্শনিকের যোগ তাই অবিচ্ছিন্ন।

দার্শনিক তাঁর সমসাময়িক যুগ ও পরিবেশকে তাঁর চিন্তার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিরাজমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা নৈতিক অবস্থার সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন। একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ যেমন, সঠিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। একজন যথার্থ দার্শনিকও তেমনি মানুষকে নিয়ে ভাবেন, মানব পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে মানবতাকে কল্যাণপথের দিগ্‌দর্শন দেয়ার চেষ্টা করেন। দার্শনিক যে জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান করেন, তা-ই সমর্থন ও সুরক্ষা করে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলাসহ মানুষের সেসব কৃতি ও কীর্তিকে, যেগুলোর অভাবে খণ্ডিত হয়ে যেত মানুষের মার্জিত জীবন। তাই তো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা নমস্য ও প্রণম্য হয়ে আছেন গণচেতনা ও মানবিক প্রগতির ধারক, বাহক ও সংরক্ষক হিসেবে। এ জন্যই বলা যায় দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়ন ও দার্শনিকদের চরিতমানস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, শিক্ষণীয়ও বটে। বস্তুত, আমরা যাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে জানি, তারা সমাজের আর দশজন মানুষের মতোই আবেগ-অনুভূতি ও সুখ-দুঃখের সংবেদনসম্পন্ন মানুষ। আর তাই জীবন ও সমাজকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ভাবের জগতে তাঁরা বন্দী হয়ে থাকেন না, থাকতে পারেন না।

দার্শনিক দৃষ্টি, সমাজ ও সুনীতি

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সব সমাজেই ন্যায়, সুনীতি ও সুবিচারের পাশাপাশি অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচারের সমারোহ ঘটেছে, অবাঞ্ছিত আচরণ মানুষের স্বরূপ ও মর্যাদা সম্পর্কে নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্রেক করেছে; এবং এভাবে ন্যায় ও সুবিচারের দাবিকে ক্রমশ জোরদার করেছে। যখনই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তখনই বিবেকবান দার্শনিকদের তরফে রচিত হয়েছে সমাজ ও চরিত্রনীতি পুনর্গঠন ও সংস্কারের আন্দোলন। যেমন ধরা যাক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগুরু সক্রেটিসের কথা। সেদিনের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে ন্যায়-সত্য-সুন্দরের বাণী প্রচারের জন্যই তাকে করা হয়েছিল অভিযুক্ত এবং অন্যায়ভাবে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। একই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, ন্যায় সত্য সুন্দরের সংগ্রাম পরিহার করে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাকে শুধু মাফ করেই দেয়া হবে না, বড় রকমের পুরস্কারও প্রদান করা হবে। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে কিছুতেই আপস করলেন না সক্রেটিস। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের শত কাকুতি মিনতি ও বাধার মুখেও তিনি সজ্ঞানে এবং অকাতরে বরণ করে নিলেন মৃত্যুকে। আর এভাবেই কোনো গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ রচনা না করেও তিনি অমর হয়ে রইলেন একজন নীতিবান দার্শনিক হিসেবে।

এই একই কথা বলা যায় বিশিষ্ট রোমান দার্শনিক সেনেকা (৩ খ্রি.পূ. ৬৫ খ্রি.) সম্বন্ধে। সাদাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং মানবতাবাদী দর্শন মনন, অনুশীলন ও প্রচারে নিবেদিত এই দার্শনিককেও অন্যায় অপবাদে চার বছরের নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। নির্বাসন জীবনের প্রথম দিকে ব্যথিত মাকে লেখা একটি চিঠিতে সেনেকা আশ্বাস দিয়ে বলেনঃ "নির্বাসন জীবন আমার কাছে মোটেই বেদনাদায়ক নয়; কারণ দর্শন পাঠ ও অনুশীলনের কারণে বস্তুগত প্রাচুর্য যেমন আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, তেমনি নির্বাসনও আমাকে কাবু করতে পারেনি। বরঞ্চ একদিক থেকে নির্বাসন আমার জন্য একটা আশীর্বাদস্বরূপঃ কারণ এই সুবাদে আমি যে অবসর সময় পেয়েছি তাতে আমি জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। এখানে আমি এ শিক্ষাও পেয়েছি যে, বিপুল বস্তুসম্পদ নয়, বেঁচে থাকার মতো যৎসামান্য সহায় সম্বল দিয়েই জীবনে তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া সম্ভব।"

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, সুস্থ চিন্তা, উদারনীতি ও মহান জীবনাদর্শের কারণে দার্শনিকদের অনেকেই ব্যাপক সুখ্যাতি লাভ করলেও তাঁদের কারো কারো মধ্যে অসার যুক্তিবাদিতা, অবাস্তব তত্ত্ববিলাস এবং অনৈতিক লোভ-লালসা লক্ষণীয়। এর ফলে যথার্থ দার্শনিকতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং দর্শন ও দার্শনিকদের সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তবে মুষ্টিমেয় দার্শনিকের এ অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দর্শনের মূল সুর ও স্বরূপের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। বেশিরভাগ দার্শনিকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও পরমত অসহিষ্ণুতাসহ সকল অশুভ প্রভাব থেকে মানবতাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা নিয়োজিত করেছেন তাঁদের চিন্তা ও কর্মকে।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধপুষ্ট মহৎ জীবন থেকে দর্শনানুশীলনকে যে কিছুতেই ছিন্ন করা সম্ভব নয়, এ যুক্তিতেই ব্রিটিশ দার্শনিক ব্র্যাডলি (১৮৪৬-১৯২৪) বলেছেনঃ "বস্তুর দাসত্বে শৃঙ্খলিত হয়ে মানুষ যেদিন তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে, যেদিন নবারুণ ও গোধুলির রক্তিম রাগ তার কৌতুহলী মনকে স্পন্দিত করবে না, যেদিন ধর্মীয় মূল্যবোধের কিংবা অজানা অচেনার প্রতি তার আর কোনো আকর্ষণ থাকবে না; এক কথায়, যেদিন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্ধ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হবে, সেদিনই কেবল সে পরিহার করবে দর্শনকে, সেদিনই সে বিচ্যুত হবে দার্শনিক জ্ঞানানুশীলন, সত্যানুসন্ধান ও মানবিক মূল্যবোধ মনন ও অনুশীলনের মহৎ পথ থেকে।" মানবজীবনের সঙ্গে দর্শনের এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেই জ্ঞানগুরু সক্রেটিস তাঁর বন্ধু ক্রিটোকে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেনঃ "তুমি যদি সত্যিই মনে কর দর্শন মানুষের অকল্যাণের হেতু, তা হলে দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল। আর আমার মতো তুমিও যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর যে দর্শনের মূল লক্ষ্য মানবকল্যাণ, তা হলে অযৌক্তিক কুসংস্কার ছেড়ে দর্শনানুরাগী হও, আমরণ দর্শনের সেবা কর।"

নৈতিকতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা

ঠিক কী ধরনের কর্ম ও আচরণ নৈতিকতার অন্তর্গত এবং নৈতিক বিচারের উপযুক্ত—এ নিয়ে নীতিবিদ্যার ইতিহাসে বহু মুখরোচক কাহিনী এবং দার্শনিক ও নীতিবিদদের মধ্যে প্রবল প্রাণবন্ত বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। নীতিবিদদের কাছে প্রথম প্রশ্নঃ নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাকৃতিক ঘটনা, উদ্ভিদ ও ইতরপ্রাণী প্রভৃতি যাদের বেলায় স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তির ধারণা প্রযোজ্য নয়, এবং যাদের ভাল-মন্দ, উচিত অনুচিত প্রভৃতি মূল্যায়ন করার আদৌ কোনো ক্ষমতা নেই, সেগুলো কি নৈতিকতার আওতাধীন? নাকি নৈতিক বিচার কেবল স্বাধীন সচেতন মানুষের স্বাধীন স্বনির্বাচিত কর্ম ও আচরণের বেলায়ই প্রযোজ্য? এসব প্রশ্নের উত্তরে বহুরকম মত, বহু যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য এ সব কিছুর পরও আধুনিক কালের নীতিবিদদের প্রায় সবাই এই মর্মে একমত যে, কেবল বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় যেসব কাজ সম্পন্ন করে, সেসব কাজই নৈতিক বিচারের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

তবে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা প্রচলনের বিভিন্ন রূপ ও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, এক পর্যায়ে এমন কি নিস্প্রাণ পদার্থকেও কিছু ঘটনার জন্য শাস্তি দেয়ার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উদাহরণ, এডওয়ার্ড ওয়েষ্টামার্ক তাঁর নৈতিক ধারণাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ গ্রন্থে এমন অনেক প্রাচীন প্রথা ও আচরণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেগুলো নৈতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার বটে। কথিত আছে যে, আদিম সমাজে হঠাৎ একটি গাছের শাখা পতনের কারণে যদি কেউ আহত হতো, তা হলে সেই শাখাটিকে কেটে কুচিকুচি করে চারদিকে ছিটিয়ে দেয়া হতো। আবার কেউ যদি কখনো পাথরে হোঁচট খেতেন, তা হলে সেই পাথরকে অভিশাপ দেয়ার প্রথা চালু ছিল। রাজা জেরেক্সেস গ্রিস আক্রমণ করতে যাওয়ার পথে হেলেসপন্ট নদীর প্রবল স্রোতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই স্রোতধারার ওপর তিনশ বেত্রাঘাত করার আদেশ দেন। শুধু তা-ই নয়, নিস্প্রাণ বস্তুর বিচারের জন্য খোদ এথেন্সেও একটি বিশেষ আদালত ছিল। তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার, ইংল্যান্ডে ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনো মালবাহী গাড়ি কাউকে চাকার নীচে পিষ্ট করলে সেটিকে বেচে দেয়া হতো এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করার বিধান চালু ছিল। ইতর প্রাণীর আচরণকেও নৈতিক বিচারের বিষয় হিসেবে গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নিন্দা করার ও শাস্তি দেয়ার বিধান ছিল। মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা সেখানকার কুমিরগুলোকে সদাচরণের জন্য বছরে একবার করে সতর্ক করে দিত এবং তার অন্যথা করলে কঠোর পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য সতর্ক করে দেয়া হতো। কোনো মৌমাছি কাউকে হুল ফুটিয়ে অন্ধ করে দিলে পুরনো আইরিশ আইন অনুসারে গোটা মৌচাকটিকে দায়ী ও নিন্দা করা হতো। নিস্প্রাণ বস্তু ও ইতর প্রাণীদের নৈতিক আচরণের কর্তা বলে মনে করা এবং সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্তের কথা মানুষের নৈতিক চেতনা বিকাশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ ধরণের সেকেলে প্রথা ও প্রচলনের বিশদ বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা হালের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলতে পারি যে, যেখানে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার এবং সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে ভালকে গ্রহণ এবং মন্দকে বর্জনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নেই, সেখানে নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রশ্ন ওঠে না, উঠতে পারেই না। তাই যদি হয়, তা হলে নিস্প্রাণ বস্তু তো বটেই, ইতর প্রাণীও নৈতিক বিচারের আওতাভুক্ত হতে পারে না। ভাল-মন্দের বাহ্য-

Dhaka University Institutional Repository

বিচার করার শক্তিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষই কেবল নৈতিক কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এ বিচারে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একজন মানুষের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে, যে সব কাজ সে করে, তার সবই নৈতিক বিচারের আওতায় আসে না, এবং এদের সবগুলো নৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেও বিবেচিত হয় না। মানুষের যে সব কাজ তার সচেতন ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যে সব কাজ সে সজ্ঞানে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করে না, সেগুলো নৈতিক ক্রিয়া বলে বিবেচিত নয়; কারণ যে গুণটি থেকে নৈতিক দায়িত্বের উৎপত্তি, এসব অনৈচ্ছিক কর্মকাণ্ডে সেই গুণটি উপস্থিত থাকে না। আর তা নয় বলেই এসব কাজের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তায় না। উদাহরণত, একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি যদি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যান, তা হলে আমরা বলতে পারি না; ছি! ছি! তাঁর মতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির এভাবে পড়ে যাওয়াটা উচিৎ হয়নি। একথা সহজেই বোধগম্য যে, এ আকস্মিক ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যথিত হতে পারেন, কিন্তু এ জন্য তিনি কিছুতেই নিজেকে দায়ী করতে পারেন না, আর এহেন অনিচ্ছাকৃত ও নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত ঘটনার পরিণতির জন্য তাঁর কোনো দায়-দায়িত্ব বহনের প্রশ্নও ওঠে না।

মোটকথা, অনৈচ্ছিক কর্ম ও আচরণ আর যাই হোক নৈতিক বিচারের আওতাধীন নয়। এদের যেমন নৈতিক কাজ বলা যায় না, তেমনি আবার অনৈতিক কাজও বলা যায় না—এরা নৈতিকতার আওতাবহির্ভূত, নৈতিকতা-অনৈতিকতা নিরপেক্ষ। অনুরূপভাবে বলা যায়, কেউ একজন অন্য কারো চেয়ে কম মেধাবী, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কম কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে নৈতিক দিক থেকে পূর্ববর্তী ব্যক্তিকে পরবর্তী ব্যক্তির চেয়ে খারাপ বলে ভাবা যায় না। ঠিক তেমনি, কারো নান্দনিক শক্তি ও রুচিবোধের সীমাবদ্ধতাকে আমরা দুঃখজনক বলে মনে করতে পারি, কিন্তু এর জন্য সেই বেচারাকে কিছুতেই খারাপ প্রকৃতির মানুষ বলে কটাক্ষ কিংবা উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ, এ এমন এক সীমাবদ্ধতা যার জন্য সে দায়ী নয়, এবং এ জন্যই এর সঙ্গে ভাল মন্দ কিংবা উচিত-অনুচিতের ব্যাপারটাকে যুক্ত করা যায় না।

একইভাবে বলা যায় বিচারবুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি এমন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের কোনো আচরণে আমরা আহত হতে পারি বটে; কিন্তু তাই বলে সেই অপরিণত শিশুটিকে আমরা নৈতিকভাবে দায়ী করতে পারি না। কারণ, তার মধ্যে এখনও দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি, আর তা নয় বলেই সে নৈতিক বিচারের আওতায় আসে না, নৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

বিচারের কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে পারে না। এমতাবস্থায় নৈতিক প্রশংসা কিংবা নিন্দা কোনোটিই তার প্রাপ্য নয়।

অন্যদিকে মানসিক প্রতিবন্দী কিংবা অস্বাভাবিক (abnormal) ব্যক্তিরাও তাদের আচরণের জন্য দায়ী নয়; কারণ তারা সজ্ঞানে সে আচরণ অনুষ্ঠান করে না, ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত প্রভৃতির পার্থক্য অনুধাবন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মসমীক্ষা ও স্বেচ্ছাকৃত নির্বাচনের ক্ষমতা তাদের নেই। অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের পর ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্দেশে যখন তারা সক্ষম হবে, কেবলমাত্র তখনই তারা যোগ্যতা অর্জন করবে নৈতিকতার এবং তখনই তাদের আচরণ আসবে নৈতিক বিচারের আওতায়। অন্যদিকে অতিমাত্রায় ড্রাগ বা মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তি যদি সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য এবং কৃতকর্মের হিতাহিত সম্পর্কে চেতনা হারিয়ে ফেলে, তখন সেও সে সময়ের জন্য নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এদিক থেকে পরিপূর্ণ উন্মাত্ততা কিংবা আংশিক বা সাময়িক মানসিক বিকৃতি—এ সবই নৈতিক বিচারের আওতা বহির্ভূত। একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সজ্ঞানে সম্পাদিত ঐচ্ছিক আচরণই নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত।

তবে এখানে এ-ও বলে রাখা দরকার যে, যদিও ওপরে বর্ণিত কিছু কিছু কর্মকাণ্ডকে আমরা নৈতিক বিচারের আওতা বহির্ভূত বলেছি, তবু সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পর এগুলোর সবগুলোকে পুরোপুরি নৈতিকতার পরিধি বহির্ভূত বলা যায় না। কারণ, পরোক্ষ হলেও এদের কোনো কোনোটির পেছনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো একটি বিশেষ খাদ্য, পানীয় বা মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ নৈতিক চেতনার নয়, জৈবিক চাহিদার ফল বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় জৈবিক প্রেষণা (motive) বা নেশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত বেসামাল, সংযম ও নিয়ন্ত্রণের সীমা লঙ্ঘনে অভ্যস্ত এবং নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত করে ফেলতে পারে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৈথুন প্রভৃতি যে কোনো অভিজ্ঞতা কিংবা ক্রিয়া, যে কোনো দৈহিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া বা অবস্থা নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক, এমন কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই যখন তাদের পরিণতির হিতাহিত সম্পর্কে সচেতন হয়েও আমরা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং পরিণামে কৃতকর্মের জন্য হতাশা বা অনুশোচনা বোধ করি। এরা আমাদের জীবনের মানবিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত, এবং এদিক থেকে এরা জীবনেরই অংশবিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

ওপরের আলোচনা থেকে এটুকু এখন পরিষ্কার যে, নৈতিক মানদণ্ড এবং সে মানদণ্ডের নিরিখে কোনো কর্ম বা আচরণের ভাল-মন্দ নির্ধারণের গোটা ব্যাপারটাই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে; একজন যা করতে চায়, তা কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া নির্বিঘ্নে করার একাধিক বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা তার আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, মানুষের কর্মপন্থা নির্ধারণের কোনো স্বাধীনতা নেই, অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। এ মতের পারিভাষিক নাম নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism)। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসী এর বিপরীত মতবাদটিকে বলা হয় অনিয়ন্ত্রণবাদ (indeterminism)। এ দুই মতের মাঝামাঝি অন্য একটি তৃতীয় মত আছে যার নাম স্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Self-determinism)। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে, নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদ দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ নয়। সুতরাং এ দুয়ের কাঠামোতেই মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক অনুসারে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম। এদিক থেকে মানুষ নিজেই নিজের কর্মপন্থার নিয়ন্ত্রক।

নিয়ন্ত্রণবাদ

নিয়ন্ত্রণবাদেরই এক কঠোর ধর্মতাত্ত্বিক রূপ অদৃষ্টবাদ নামে পরিচিত। এ মতে যা কিছু ঘটে তার সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত, সবকিছুই অলঙ্ঘনীয়ভাবে পূর্ব নির্ধারিত। সুতরাং এ ব্যাপারে মানুষের কিছুই করার নেই। এ মত প্রাচীন গ্রিস ও রোমে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহ্যে, বিশেষত হোমারের ইলিয়ড ও ওডেসি গ্রন্থে মানুষকে বর্ণনা করা হয়েছে দেবতাদের খেয়াল-খুশির তাঁবেদার মহৎ ও চমৎকার একটি প্রাণী হিসেবে। তখন মানুষের জন্ম মৃত্যুকে মনে করা হতো অজ্ঞাত দৈবশক্তি নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টের ফল বলে। অদৃষ্টবাদ অনুসারে আমরা যা-ই ভাবি, অনুভব ও পরিকল্পনা করি না কেন, আমাদের সব চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের ফেরে চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। আমি যা-ই করি বা ভাবি না কেন, যা ঘটার তা অনিবার্যভাবে ঘটবেই। তাতে আমার বা অন্য কারো বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। মানুষের সব ইচ্ছা ও কর্ম সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা চালিত। তার একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। মার্কিন প্রয়োজনবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) এ মতের নাম দিয়েছেন অনমনীয় নিয়ন্ত্রণবাদ (hard determinism)।

আগেই বলা হয়েছে অদৃষ্টবাদ প্রধানত একটি ধর্মতাত্ত্বিক মত। ধর্মভাবাপন্ন সাধারণ মানুষ মনে করে যে, মানুষ তার পূর্ব নির্দিষ্ট বিধিলিপি নিয়ে জন্মায়। তাই সে যতই চেষ্টা বা সংগ্রাম করুক না কেন এ অদৃষ্টের লিখন

Dhaka University Institutional Repository

বদল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অর্থে অদৃষ্ট মানে পূর্বনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ভাগ্য। ভারতীয় দর্শনে দৈব এবং মুসলিম দর্শনে তকদির কথাটা এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুসলিম দর্শনের আদি পর্বে জাবরিয়া ও কাদরিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। জাবরিয়ারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের যুক্তিটি এরকমঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র দুনিয়ার নিরঙ্কুশ শাসক। আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে সসীম মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলে কিছু নেই, থাকতেই পারে না। আর এ অবস্থায় ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি আচরণের নৈতিক দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তায় না। এসবই আল্লাহর ইচ্ছার ফল। তদানীন্তন উমাইয়া শাসকরা এ মতের অজুহাতে সব রকম শোষণ-পীড়ন দুঃশাসনকে যুক্তিযুক্ত করার প্রয়াস পান। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, এসব কর্মকাণ্ডের সবই আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্দিষ্ট। সুতরাং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অর্থহীন ও অসঙ্গত। এ মতের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থক কাদরিয়া সম্প্রদায়। তাঁরা কোরআনের বাণীর বরাত দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। নিজের ইচ্ছা ও যুক্তি বিচারের আলোকে কর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা মানুষের আছে।

পাশ্চাত্য দর্শনে অদৃষ্টবাদ বা পূর্ব নিয়ন্ত্রণবাদের জোর সমর্থন লক্ষ্য করা যায় প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মবেত্তা জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৬৬৪) এর ঘোষণায়। তাঁর মতে, মানুষের কর্ম ও আচরণের নৈতিক শুভাশুভ ও চূড়ান্ত পরিত্রাণ (salvation) তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। কারা স্বর্গলাভ করবে আর কারা নরকে যাবে, এ সবই ঈশ্বর আগে ভাগে ঠিক করে রেখেছেন। কার ভাগ্যে কী আছে তা যেহেতু কেউই জানে না, সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ ভাল কাজ করা, যাতে সে ঈশ্বরের দয়া ও করুণা লাভ করতে পারে। এভাবে ক্যালভিনপন্থীরা ঈশ্বরকে সবকিছুর চূড়ান্ত কর্তা এবং মানুষকে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করে।

নিয়ন্ত্রণবাদে যে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি, তাকে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অনেকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। সার্বিক যন্ত্রবাদ ও বিমূর্ত একত্ববাদ– এ দুই মতবাদ কঠোর বা অনমনীয় নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক। বিজ্ঞান সার্বিক কার্যকারণ নিয়মে বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে নিয়ন্ত্রণবাদ বলতে বোঝায় এমন একটি মতবাদকে যেখানে মনে করা হয় যে, মানুষসহ সমগ্র জগৎ এক নিরঙ্কুশ কার্যকারণ নিয়মের অধীন। জগৎসংসারের প্রতিটি ঘটনা ও কার্য তার পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা-ই যদি হয়, তা হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নই ওঠে না।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, কারো কোনো নৈতিক আচরণের গুনাগুণ বিচার করতে হলে, সে যে সমাজের সদস্য এবং যে সমাজের সঙ্গে সে নানাভাবে যুক্ত, সে সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ সাধনে তার ভূমিকা সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে।

সোজা কথায়, ব্যক্তির আচরণ সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণের তথা সমাজের অগ্রগতি কিংবা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এ যুক্তিতেই এরিস্টটল মানুষকে অভিহিত করে ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সমাজে বাস করে না, সে হয় একজন ফেরেশতা নয়তো স্রেফ একটা জানোয়ার।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটি প্রদীপ যেমন একা রাতের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না, তেমনি কারো একক চেষ্টায় মানুষের ব্যাপক কল্যাণ আশা করা যায় না।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতার বিকাশ তথা একটি সুন্দর ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়তে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব এবং অনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান এমন একটি সমাজে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে নৈতিকতা তথা সামাজিক অন্যায় অবিচার দূর করা সম্ভব।

৩.৫ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও উন্নয়ন ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই উন্নয়ন এবং উন্নয়নমুখী প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করা জরুরী।

বহু সংখ্যক লেখক ও গবেষকের মতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এলিটদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ বলেছেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক এলিটদের সক্রিয় ভূমিকা ও উদ্যোগ অপরিহার্য। এডওয়ার্ড সিলস বলেছেন, "এর (উন্নয়ন) জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সিভিল সার্ভিসের আয়তন বৃদ্ধি আর কর্মকর্তাদের ক্ষমতার ব্যাপক প্রসার"। জোসেফ লা পালোমবারা তাদের ভূমিকার উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন। "সাধারণ বিধিবিধান নির্ধারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের জন্য কিছু মৌল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা উন্নয়নমূলক কর্মের প্রান্তরেখায় সীমিত রাখার দিন ফুরিয়েছে।" সমাজের জনশক্তি, সম্পদ ও বৈদেশিক সম্পর্কের সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে সৃষ্টিধর্মী পদ্ধতিগুলোকে গতিশীল করবার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

স্পেঈলারও অনুরূপভাবে বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূলত উন্নয়নমূখী প্রশাসনের আধুনিক ধারণার জন্ম হয়েছে এ মতবাদ ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিই হোক আর নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই হোক অথবা জনশক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগই হোক, সরকারের ব্যাপক অংশগ্রহণ ব্যতীত তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেও সরকারের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক মনে হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের সুসামঞ্জস্য আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার, সংকীর্ণ মনোভাবের স্থলে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ প্রভৃতিকে কার্যকরী করা সরকারের অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্ভব নয়। এভাবে উন্নয়নমুখী প্রশাসনের উপর সকলের আস্থা সুদৃঢ় হয়েছে।

এ অবস্থার কারণও অবশ্য অনেক। প্রথমতঃ বহু উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক রূপান্তর আনয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তারাই হচ্ছেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য সামাজিক অংশ। দ্বিতীয়তঃ অনেক সমাজে অগ্রগতি সাধনের উপযোগী "যে পেশাগত, কৌশলগত ও উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম" সম্পদ বিদ্যমান তার অধিকাংশই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়তঃ উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে আধুনিক অংশ, আর এ অংশ অত্যন্ত সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ। চতুর্থতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। ফলে এসব লেখক ও গবেষকদের সিদ্ধান্ত হল, প্রশাসনিক এলিটদের বিরাট ভূমিকা ও গভীর উদ্যোগ ব্যতীত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সহজলভ্য হবে না।

উন্নয়ন কি?

উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত, অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত, পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্য বিশ্লেষণ করতে হবে। তাছাড়া, যে নীতির ফলে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জিত হবে তাও অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন নীতি প্রণীত হতে পারে, তবে যে নীতি সমাজ জীবনে তুলনামূলকভাবে অল্প সংঘাত সৃষ্টি করে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই কাম্য। উন্নয়নের আভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী। এ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে পরিপূর্ণতা। কিন্তু গবেষক ও লেখকরা এ অর্থে উন্নয়নের বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন না। বিশেষ কোন এক সময়ে সমাজ জীবন পরিপূর্ণ হবে অথবা সামাজিক জীবনে নেমে আসবে অসম্পূর্ণতা অধিকাংশ লেখকই তা বিশ্বাস করেন না। "কোন সমাপ্তি পূর্বের লক্ষ্য ব্যতীত কোন সমাজ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হলে সমাজের সে গতিশীল পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করা হয়।" সহজ কথায়, উন্নয়ন হচ্ছে "আকাঙ্ক্ষিত, সাধারণভাবে পরিকল্পিত আর সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তন।"*

উন্নয়নকে অনেক সময় আধুনিকীকরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত লেখায় ও প্রবন্ধে শব্দ দু'টি অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোন কোন লেখক আবার উন্নত সমাজ বলতে বুঝিয়েছেন এমন সমাজকে সেখানে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে উপণীত হয়েছে, যেখানে জনগণ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও গতিশীল এবং যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। কোন কোন লেখকের মতে, উন্নত সমাজ হল এমন এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টিধর্মী ও সহানুভূতি সম্পন্ন আর অর্জন স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ। কেউ কেউ আবার উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে যদি প্রচলিত রাজনৈতিক কৃষ্টির পরিবর্তে পৌর কৃষ্টি বিদ্যমান থাকে তাহলে সে সমাজ উন্নত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জনগণের উপভোগের চরম পর্যায়ের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয় যে সমাজ সে সমাজ উন্নত। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত এক গ্রন্থে উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে এমন এক প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে। উন্নয়নের এসব সংজ্ঞায় এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর পরিচয় মেলে যা পাশ্চাত্যের উন্নত সমাজে বিদ্যমান আর লেখকরাও এমন ইঙ্গিত দান করেছেন যে, প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উন্নয়নের এসব ধারণা বিভিন্ন কারণে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ এতে মনে হয় যে, উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন উঁচু পর্যায়ের নগরায়ণ, শিল্পায়ন আর মাথাপিছু আয়ের উচ্চতর পর্যায় যা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু রাষ্ট্রের জন্যে অর্জন অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এ ধারণা কৃষ্টিভিত্তিক। এগুলোতে উন্নয়নের মডেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ে উঠেছে অ্যাংলো আমেরিকান মডেল। তৃতীয়তঃ এ ধারণা সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একদিক নির্দেশ করে। আর এছাড়া যে অন্য পন্থা রয়েছে তা অস্বীকার করে। বাস্তবে কিন্তু অন্য পন্থা অবলম্বন করেও কোন কোন সমাজ উন্নয়ন অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা বলা যেতে পারে।

* বাংলাদেশ লোক প্রশাসন অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমেদ।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য উন্নয়ন শব্দটির সাধারণ অর্থ গ্রহণের জন্যই উইডনার সুপারিশ করেছেন। এ অর্থে উন্নয়নশীল দেশের জন্য উন্নয়ন হচ্ছে আধুনিকীকরণের পথে শুভ যাত্রা আর জাতিগঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন। মিল্টন এসম্যানও এভাবে উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে উন্নয়নের লক্ষ্য হল জাতিগঠন আর সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি। উন্নয়নের এ সংজ্ঞায় অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

অতএব, উন্নয়ন তিনধরনের পাওয়া গেলঃ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো যায় ঃ

সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তেমনি পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বুঝায় একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি প্রধান ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি যা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সনাতন ব্যাখ্যা হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতে অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং বন্টনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তৃতীয় ব্যাখ্যাটিতে শুধু অর্থনৈতিক উপকরণকেই বিবেচনা করেনি। অধিকন্তু এটাতে জীবনযাত্রার মান এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সনাতন ব্যাখ্যার প্রবক্তারা মনে করেন যে, কোন দেশের জাতীয় আয় যদি চলমানভাবে শতকরা ৫% থেকে শতকরা ৭% হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির অংশ যদি হ্রাস পায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য খাতের অংশ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলেই বুঝতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। অর্থাৎ তারা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকে পরিমাপক হিসেবে ধরে নিয়ে উন্নয়নের সংজ্ঞা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

".....economic development is the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time"*

ডি. গাউলেট-এর মতে, মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটানোর উন্নতি ঘটলে, মানুষের আত্মসম্মানবোধ এবং মর্যাদার উন্নতি হলে এবং বস্তুগত অগ্রগতি যদি ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা এবং জীবন প্রণালীর বিভিন্ন দিক পছন্দ করার পূর্ণ সুযোগ পায় তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে। এই মতাবলম্বীরা আরো বলে থাকেন যে, কোন দেশ যদি অন্যের দ্বারা শোষিত না হয়, পরনির্ভরশীল না থাকে, তা হলে ঐ দেশের মানুষ অভাব, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। এই মতে, মাইকেল পি. টডেরো অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ

"Development must, therefore, be conceived of as a multidimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes, and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of absolute poverty. Development, in its essence, must represent the entire gamut of change by which an entire social system, tuned to the diverse basic needs and desires of individuals and social groups within that system moves a ways from a condition of life widely perceived as unsatisfactory and toward a situation or condition of life regarded as materially and spiritually better"*

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান অঙ্গ। চতুর্থতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটবে এবং মানুষের জীবন যাত্রায় আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আসবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ সংজ্ঞাটি একটি বিস্তীর্ণ সংজ্ঞা যা কিনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের আধুনিক এবং সনাতন মতবাদের সমন্বয় সাধন করেছে।

* G.M. Meier. Leading Issuess in Economic Development. p-7

* Michael P. Todaro. Economic Development in the third World (New York: Longman Inc. 1983) P.85

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই বিভিন্ন পর্যালোচনা এবং আলোচনার মাধ্যমে এটাই বলা যায় যে, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী এমন একটা কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৩.৬ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী কিছু প্রতিবন্ধকতা ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে অনেক সময়ে কিছু ব্যাপার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে মানুষের মধ্যে অন্ধভাবে প্রচলিত ধর্মান্ধতা, অপসংস্কৃতি, পুঁজিবাদ, জাতিসত্ত্বা প্রভৃতি।

(ক) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও ধর্মান্ধতা ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর জন্য সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়টা তা হচ্ছে উদার এবং বিকাশমান মানসিকতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। যে সমাজ ধর্মান্ধতার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে ব্যর্থ হয় সে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তাই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়া শুরুর আগেই ঐ জনগোষ্ঠীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, পরশ্রিকাতরতা, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালাতে হবে।

অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে ধর্মে উল্লেখ না থাকলেও অনুমান বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে অন্ধভাবে কোন কাজ করা সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। তেমনিভাবে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে অনেক সময় হুমকিস্বরূপ।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও সংখ্যালঘু ইত্যাদি হীনমন্যতা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক করে তোলে। তাই সর্বপ্রথমেই এ ব্যাপারে এ্যাডভোকেসী করা প্রয়োজন।

(খ) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও অপসংস্কৃতি ঃ

সংস্কৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ কালচার। ইংরেজি সাহিত্যে কালচার কথাটার প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষভাগে। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের কাজ যেখানে প্রকৃতির প্রতি অনুগত

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই প্রকৃতিকে জয় করা, সেখানে কাব্যসাহিত্য তথা কালচারের লক্ষ্য সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মানবমনকে প্রকৃতির যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করা ও সৃজনশীল মার্জিত জীবনের সন্ধান দেয়া। কর্ষণ (কালটিভেশন) বা চাষবাসের মাধ্যমে একটা জমিকে যেভাবে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলা হয়, তেমনি কৃষ্টি বা সাংস্কৃতিক কর্মধারার মাধ্যমে মানুষের অপরিশীলিত চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণকে পরিশীলিত এবং প্রেমপ্রীতি, সত্য সুন্দর কল্যাণের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়ঃ "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মানুষের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাহাই, এ জন্য ইংরেজীতে উভয়ের নাম culture।"*

ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে ম্যাথ্যু আর্নল্ড, ইমারসন প্রমুখ পাশ্চাত্যে এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাচ্যে, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতামতে কিছু পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই ছিলেন একমত; আর সেটি হলো এই যে, সংস্কৃতি মাত্রই সর্বতোভাবে একটি অন্তরলোকের ব্যাপার—সংস্কৃতি মানেই মানসিক অনুশীলন, সুরুচি ও শিষ্টাচারের চর্চা। তবে এ অর্থে সংস্কৃতির উৎপত্তি যদিও ব্যক্তিগত সুরুচি ও শিষ্টাচারে, এর বহিঃপ্রকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, ললিতকলায়, ধর্মে ও দর্শনে। এটি অবশ্য সংস্কৃতির সঙ্কুচিত অর্থ, আর সংস্কৃতিতে এ সঙ্কুচিত অর্থে ব্যবহারের অর্থই হলো একে নিছক চিন্তার, অনুভবের, জ্ঞানের তথা বিশুদ্ধ মননচর্চা বা চিৎপ্রকর্ষের ব্যাপার বলে বিবেচনা করা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন ও স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দেয়া।

এ মত স্পষ্টতই ভাববাদী ও রোমান্টিকধর্মী। আর হালের বাস্তববাদী পরিবেশে তা প্রায় অচল। এর অবশ্য একটা আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা আছে। বিশ শতকের শেষ অবধি পৃথিবীর অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরুপদ্রব; এবং এ কারণেই সেদিনের ভাবুক, দার্শনিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকেরা জগৎ ও জীবনকে দেখতেন ভিন্ন চোখে ও রোমান্টিকতার রঙিন চশমায়। বাস্তবতা যে আদর্শ থেকে বহু দূরে এবং জীবনের যে একটি রুদ্র ভয়াল রূপ আছে, তা তাঁরা অনেকটা উপেক্ষা করেন; আর মূলত এ কারণেই তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদর্শায়িত করে ফেলেন বাস্তবতাকে, সাধারণ বস্তুতে আরোপ করেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বিমূর্ত বিশুদ্ধ আদর্শকে।

নীতিবিজ্ঞান ও মানব জীবন-৩১২ পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিশ শতক পৃথিবীতে এসে হাজির হলো মানবতার দুঃখ-বঞ্চনার এক মর্মান্তিক তালিকা নিয়ে। দেখতে দেখতে বিশ্বময় পরিবর্তন ঘটলো আর্থ-সামাজিক অবস্থার, বদলে গেল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের গতানুগতিক রোমান্টিক ধারণা এবং একই সঙ্গে সংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের চিন্তা–ভাবনাও গেল বদলে। এ সত্য তখন ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে যে, সংস্কৃতির যেমন রয়েছে একটি অভ্যন্তরীণ মানসিক দিক তেমনি আছে অপর একটি বহিরাঙ্গিক বাস্তব দিক। এতে যেমন রয়েছে মননচর্চা বা চিৎপ্রকর্ষের স্থান, তেমনি থাকা চাই বাস্তব জীবনবোধ ও বিষয়বুদ্ধির অবকাশ। এ পরিবর্তিত অর্থে সংস্কৃতি, নৃত্যকলা কিংবা কাব্যচর্চাকে বোঝায় না, বোঝায় ধান-পাটের চাষ থেকে শুরু করে ভাস্কর্য, স্থাপত্যসহ সবরকম শ্রমসাধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনকর্মকে।

এ মতে, সংস্কৃতি জীবনের বাস্তব প্রতিফলনস্বরূপ; আর জীবনের যেহেতু রয়েছে সুখ–দুঃখ, শান্তি-সংঘাত, সাফল্য-বৈফল্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, তেমনি জীবনের প্রতিবিম্ব হিসেবে সংস্কৃতিরও থাকবে একটা বহুমাত্রিক বিস্তৃত পরিসর। এ ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকেই ইদানীং সামাজিক সংস্কৃতি, নৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন নামের প্রচলন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সংস্কৃতির নৈতিক রূপ স্বরূপ নিয়েও স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধারণা ও মতামত প্রচলিত রয়েছে। যেমন, নৈশক্লাবে পানাহার, নাচগান ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার যে দীর্ঘদিনের পশ্চিমা রেওয়াজ, তা আমাদের এ অঞ্চলের অনেকের কাছেই সুস্থ শালীন সংস্কৃতি বলে স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে আবার মা-বাবা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট পরিজন নিয়ে একান্নভুক্ত পরিবারের আমাদের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তা পাশ্চাত্যের মুখরোচক পরিহাস ও তির্যক ভ্রুকুটির বিষয়। শুধু তা-ই নয়, আমাদের নান্দনিক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ভোজনবিদ্যায় যা অরুচিকর অখাদ্য বলে বিবেচিত, সেই কুকুর, সাপ, শামুকের মাংসই কোনো কোনো দেশে ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরম উপভোগ্য সুখাদ্য বলে নন্দিত।

এটি সংস্কৃতির দেশান্তরিক নমুনা। একইভাবে কালান্তরেও বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশে বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতির ধারণা ভিন্নতর, এমনকি বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। যেমন ধরা যাক আমাদের বাংলাদেশের আবহমান কালের কিছু সাংস্কৃতিক প্রথা প্রচলনের কথা। এককালে যে জারি সারি ভাটিয়ালি মুর্শিদি ভাওয়াইয়া গান ছিল আমাদের আপামর জনগণের প্রাণস্বরূপ, যে পুঁথিপাঠ ও গাজী পাঠ ছিল নিত্যদিনের সাংস্কৃতিক আকর্ষন,

Dhaka University Institutional Repository

যেগুলোর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হতো এ দেশের গণমানুষের অন্তরের সুর, সেগুলোই আজ বিলুপ্তপ্রায়, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমে তথা আকাশ সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও আগ্রাসনের ফলে। এই একই প্রক্রিয়ায় আজ পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানাদির সাথে পাল্লা দিয়ে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় মহাসমারোহে, কখনো কখনো অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে, আয়োজিত হচ্ছে থার্টি ফার্ষ্ট নাইট-এর পাশ্চাত্য স্টাইলের অনুষ্ঠান। ফলে দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির দুর্বিসহ বিকৃতি ও মর্মান্তিক অবক্ষয়ের রাজনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি প্রায় সব ক্ষেত্রে এক সর্বনাশা অপসংস্কৃতি বিস্তারের আক্ষেপ ও আর্তনাদ।

এইতো গেল আমাদের সামাজিক নৈতিক সংস্কৃতির কথা। সংস্কৃতির ধারণা যে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তার এক তরতাজা দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় জীবনের সাম্প্রতিক ইতিহাস। এই ইতিহাস সুখকর নয় মোটেও। মনে পড়ে ছোটবেলায় সেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের জীবনে সৃষ্টি হয় এক নতুন উদ্যম; কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে স্বপ্নভঙ্গের এক মর্মান্তিক পালা। ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষকে রচনা করতে হয় একের পর এক আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে।

অপসংস্কৃতি সামাজিক এ্যাডভোকেসীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে। তাই সামাজিক এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতিও ক্ষতিকর বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাই এ ব্যাপারে সামাজিক এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই।

(গ) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও পুঁজিবাদ ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও পুঁজিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাইকেল নোভাক এর দরিদ্রের জন্য পুঁজিবাদঃ গণতন্ত্রের জন্য পুঁজিবাদ আলোচনাটা জরুরী বলে মনে হচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও পুঁজিবাদ ঃ

উইনস্টন চার্চিল একদা বলেছিলেন যে, গণতন্ত্র একটি খারাপ সরকার ব্যবস্থা, তবে অন্য সব ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে এ কথা প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদ সম্পর্কেও অনেকটা একই কথা বলা চলে। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যা কবিকুল, দার্শনিকবৃন্দ, অথবা ধর্মগুরুদের দ্বারা নন্দিত হয়নি। সময়ে সময়ে এটি নবীনদের কাছে রোমান্টিক বলে মনে হলেও, সব সময়ে তা হয়নি। পুঁজিবাদ এমন একটা ব্যবস্থা, যা সবচাইতে বেশি সমাদৃত হয় মধ্যবয়স্ক লোকদের দ্বারা, আর এটি হয় মানুষের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর। পুঁজিবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্যে কাউকে অতিমাত্রায় উৎসাহী হতে হয় না। আরভিং ক্রিষ্টল একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ছিল "পুঁজিবাদের জন্যে দুই প্রস্থ অভিনন্দন।" এতে হয়তো কিছুটা অতিশয়োক্তি ছিল। কারণ, বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনা করলে একটি অভিনন্দনই যথেষ্ট ছিল। চার্চিলের নিজস্ব পর্যালোচনা ও অনুসন্ধিৎসার পরিমণ্ডল হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন। তার এ দু'টি ক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হয়, ভাবা উচিত হবে না যে, কোনো একটি পদ্ধতি হচ্ছে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার রাজত্ব। পুঁজিবাদও নয়, সমাজতন্ত্রও নয়। দু'টোকে মিলিয়ে যে পদ্ধতি হবে তাও নয়। এসব পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বোত্তম যে কথা তা হচ্ছে এই যে, অন্য কোনো জানা বিকল্প ব্যবস্থার চাইতে সাধারণ নাগরিকের অধিকার, সুযোগ ও বিবেক বোধকে যেটি ভালভাবে রক্ষা করতে পারে, তা হচ্ছে পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার সমাহার।

এই পৃথিবীতে অনেক লোকই কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাধারার চেয়ে অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে, আমেরিকাতে লোকেরা এই কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাধারাকে এখন বাদ দিয়ে চলেছে। অন্তত "ফেডারেলিষ্ট" পত্রিকার ১০ম সংখ্যায় তাই বলা হয়েছে। মানুষ এমন একটি বাস্তব দর্শন পছন্দ করে, যা "কাজ করে", বিশেষ করে, অন্য কোনো জানা বিকল্প ব্যবস্থার তুলনায় যা অধিকতর কার্যকর। অবশ্য, মানুষের মনে কিছু আদর্শ রয়েছে, যার আলোকে সে স্থির করে নেয় যে, কোনটা ভালোভাবে কাজ করে, আর কোনটার ফল মন্দ হয়। সৌভাগ্যবশত মানুষ নিজেদের বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে কিছু কিছু কর্মপদ্ধতি এমনভাবে নিরূপণ করে নেয়, যাতে একটির সাথে অন্যটি মিশে না যায় বা এ সব আদর্শের মধ্যে কোন সংঘাত না ঘটে। মানুষ বিশেষ করে যত্নবান হয় যাতে মোটামুটি 'ভালো' যেন 'সম্পূর্ণ ভালো'র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না দাঁড়ায়। যার অস্তিত্বই নেই, এমন কিছু

Dhaka University Institutional Repository

যদি খুঁৎহীনও হয়, তবুও তার চাইতে যে সব জিনিস বাস্তব কিন্তু কিছুটা ত্রুটিযুক্ত তাকে গ্রহণ করতে মানুষ প্রস্তুত।

পুঁজিবাদের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিকল্প থাকলেও পুঁজিবাদের পক্ষে দু'টি শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, অন্য যে কোনো পদ্ধতির তুলনায় পুঁজিবাদ দরিদ্রদের দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে অধিকতর ভালোভাবে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের সত্যিকারের সাফল্যের জন্যে পুঁজিবাদ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। অবশ্য, এ সংক্রান্ত বিতর্কের পূর্বে বিকল্প পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে।

আজকের পৃথিবীতে পুঁজিবাদের মাত্র দু'টো সত্যিকারের বিকল্প রয়েছে। একটি হলো সমাজতন্ত্র, যা উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম, চীন প্রজাতন্ত্র এবং অন্য দু' একটি স্থানে দেখা যায়। আর একটি হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বে অনুসৃত চিরাচরিত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এটি দেখা যায় লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে, আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে এবং এশিয়ার বৃহদাংশে।

অনেক লোক হয়তো বলবে যে, জার্মানি ও স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশসমূহে যে সামাজিক গণতন্ত্র চালু রয়েছে, তা হচ্ছে তৃতীয় বিকল্প। এ ক্ষেত্রে বলা অধিকতর সঠিক হবে যে, এ ধরণের সামাজিক গণতন্ত্র একেবারে বামঘেঁষা। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেশ দূরে এভাবেই "ক্যাপিটালিস্ট রিভলিউশান" পত্রিকায় পিটার বার্জার তথ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের পক্ষে একটি যুক্তি হচ্ছে এই যে, এ সব দেশের শীর্ষস্থানীয় সমাজতন্ত্রীরা এ সব পদ্ধতিকে "পচা, দুর্নীতিপরায়ন, বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী, দেশজ" বলে আখ্যায়িত করে। তাদের সমালোচনার লক্ষ্য থাকে, এ সব পদ্ধতিকে সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। যদি সমাজতন্ত্রীরা এ সব দেশকে "সমাজতন্ত্রী" বলে আখ্যায়িত করে, তবে তা হবে অত্যন্ত খুশির ব্যাপার।

সুতরাং এক্ষেত্রে দু'টো প্রস্তাব খাড়া করা যায়, যার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ পুঁজিবাদ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভাঙতে সুযোগ খুঁজে নিতে, নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ পুরোপুরিভাবে আবিষ্কার করতে এবং মধ্যবিত্ত ও তদুর্ধ শ্রেণীতে উন্নীত হতে সুযোগ করে দেয়। পুঁজিবাদ তৃতীয় বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় বেশি কার্যকর। এই পদ্ধতি অনুসরণকারী দেশসমূহের রাস্তায় লোকদের মুক্ত স্বাধীন লোকের মত ভীড় করতে অথবা হাঁটতে দেখা যাবে মেরুদণ্ড সোজা করে অভীষ্ট কোনো লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যভাবে বললে বলা চলে, পুঁজিবাদ দরিদ্রদের জন্যে সমাজতন্ত্র অথবা তৃতীয় বিশ্বের সনাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। এ তত্ত্বের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বের দরিদ্রদের দেশান্তরে যাবার ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে। তারা কোন দেশ থেকে অন্যত্র যায় এবং কোন দেশে যায়? দেখা গেছে যে, ব্যাপকভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক এবং তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসে ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের দরজায় ধর্ণা দেয়। ব্রডওয়ের কোনো অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের জন্যে অনেক সময় নাট্যোমোদীরা যেমন লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে থাকে, এটিও অনেকটা তেমনি।

আরও একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে, বস্তুতপক্ষে যে কোনো পুঁজিবাদী দেশের যে কোনো জনগোষ্ঠীর পেছনের ইতিহাস ঘেঁটে তাদের পূর্ব পুরুষদের দারিদ্র্যাবস্থার সন্ধান পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে যারা বাস করছেন, তাদের একটি বিরাট অংশের পেছনের ইতিহাস ঘাঁটলেই সন্ধান পাওয়া যাবে, তাদের পিতামাতা অথবা তাদের পিতামহ কিম্বা মাতামহদের কারা দরিদ্র ছিল। ১৯০০ সালে আমেরিকার একটি বিরাট অংশ দরিদ্র অবস্থার মধ্যে বলতে গেলে কোনোমতে 'দিন আনা দিন খাওয়া' অবস্থায় বাস করতো। আর আজ সেই পরিবারগুলোর মধ্যে অধিকাংশ প্রাচুর্য্যের মাঝে অবস্থান করছে বলে ধরা যায়। পারিবারিক স্মৃতির ইতিহাসে যারা ছিল দরিদ্র, তারা আজ উঠে এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে।

এখানে পর্যায়ক্রমিক অবস্থান নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। এখানে পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে, ব্যক্তি সম্পর্কের নয়। পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি সামাজিক পদ্ধতি। মানব ইতিহাসে পুঁজিবাদ একটি নতুন পদ্ধতিও। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, এই পদ্ধতি প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মাত্র কয়েক প্রজন্ম পরে আবির্ভূত হয়। অবশ্য, এর আগেও এ পদ্ধতির আবির্ভাবের পূর্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়েছে। আর.এইচ. টনিও পুঁজিবাদকে পরে আবির্ভূত একটি পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চার্চিলের মতে, এই দু'জন চিন্তাবিদ এবং আরও অনেকে পুঁজিবাদের মূল কথাটির ভুল বিশ্লেষণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের চিন্তা ধারার এই অংশ সত্যি যে, 'পুঁজিবাদ' বলতে যে নতুন পদ্ধতি বোঝায়, তা গত দু'শ বছর হলো অস্তিত্বে এসেছে। ১৮৪৮ সালে এই পদ্ধতিটির নতুনত্ব ও ব্যাপকত্ব দেখে চমৎকৃত হয়ে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "মাত্র ১০০ বছরের শাসনামলে বুর্জোয়া পদ্ধতি যে ব্যাপক, বিরাট ও সর্বাত্মক উৎপাদনশীল শক্তির পরিচয় দিয়েছে তা পূর্বের সব প্রজন্ম একযোগে কাজ করেও সম্ভবপর হয়নি।" ১৮৪৮ সালে তিনি এই পদ্ধতির অর্ধেকও দেখে যেতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা বিশারদরা হিসেব করে দেখেছেন যে, ১৭৪০ সালে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ কোটি। তখন মৃত্যুর গড়পড়তা বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। আর ঠিক ১৯৪ বছর পরে এই জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে কাজ করেছে ঔষধ, ভেষজ শাস্ত্র, পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার। আজ এমনকি দরিদ্রতম জাতিসমূহের মধ্যেও গড়পড়তা মৃত্যুর বয়স দাঁড়িয়েছে ৫৮ বছরের বেশিতে। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশসমূহে মৃত্যুর গড়পড়তা বয়স ৭৫ বছর ছাড়িয়ে গেছে। এই দীর্ঘায়ুর জন্যে এখন পৃথিবীতে জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তাদের বাস্তব অবস্থা ২০০ বছর আগেকার তুলনায় অনেক ভালো। এর একটি ছোট উদাহরণঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেরই ছিল কাঠের দাঁত এবং জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর ডাক্তারদের অস্ত্রোপচারের দরুন রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় বড় যুক্তি হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত; প্রয়োজনীয় তবে পর্যাপ্ত শর্ত নয়। চোখের সামনে আমরা যে সব দৃষ্টান্ত দেখছি, এটি তার ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত। এমন দেখা গিয়েছে যে, কিছু কিছু দেশ আছে যেগুলো পুঁজিবাদী কিন্তু গণতান্ত্রিক নয়। কেবল পুঁজিবাদী বলেই একটি দেশ গণতান্ত্রিক হবে এমন কোনো কথা নেই। তবুও গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, চিলি (পিনোচেটের পরবর্তী পর্যায়), দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্য কিছু দেশের দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় যে, যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটি বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তবে সে সব দেশের গণতন্ত্র সুষ্ঠু হবার জন্যে চাপও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এর কারণ হচ্ছে যে, সফল অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক উদ্যোক্তারা খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে যে, সমরনায়ক ও শাসনকর্তাদের চেয়ে তারা অধিক ফলিৎকর্মা ও অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে। তখন তারা স্বায়ত্বশাসনের দাবি তুলতে শুরু করে।

প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত হয়েছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের জন্মের পেছনের বীজতলা স্বরূপ। মুক্তবাজার যেমন মুক্ত নীতি অনুসরণ সহায়ক হয়, তেমনি পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের পথ প্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায় উভয় ক্ষেত্রে আইনের শাসন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপ সীমিত থাকা জরুরী। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বিশেষের ও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার রক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র যে পাশাপাশি চলে তা বলা যায় না। বিশেষ করে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জগতে এদের উভয়ের গতিশীলতা এবং বেঁচে

Dhaka University Institutional Repository

থাকার আগ্রহ এদেরকে পরস্পরের সহযোগী করে তোলে। তাই "পুঁজিবাদ" এবং "গণতন্ত্র" যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি রাষ্ট্র ও অর্থনীতিও।

এই ভিত্তিতে পূর্বাভাস দেয়া যায় যে, চীন প্রজাতন্ত্রে, বিশেষ করে এর দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশসমূহে যখন ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের সৃষ্টি হবে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা অর্জন করবে তখন দেখা যাবে যে চীনে ক্রমাগত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বে আসবে। চীনে তখন মুক্ত অর্থনীতি এমন চালিকা শক্তির জন্ম দেবে যা চীনকে মুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে চালিত করবে। এক মুহূর্তের জন্যে এই প্রতিপাদ্যের অন্য দিকটির প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। যদিও কিছু একনায়ক তাদের দেশে পুঁজিবাদ চালু করতে দিয়েছে এবং যদিও এই পদ্ধতিতে অর্থনীতির ওপর তাদের নিজস্ব ক্ষমতা খাটানোর ওপর বেশ বড় রকম সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয় তবু এক ব্যক্তির শাসনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে পুঁজিবাদকে ভঙ্গুর করে তোলে। এই ত্রুটি মানুষের মরণশীলতা এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যথার্থ উত্তরাধিকারের সমস্যাজাত। একনায়কত্ব ক্ষমতা হস্তান্তর তথা উত্তরাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরাট জটিলতার সম্মুখীন হয়। গণতন্ত্রের বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, এই পদ্ধতি ঐ সমস্যাটির একটি স্বাভাবিক, নিয়মিত ও শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করে। আর, এ কারণেই পুঁজিবাদের দীর্ঘস্থায়ী উপকারিতার জন্যে এই প্রকল্প উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতায় উত্তরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপরিহার্য শর্ত।

কিন্তু প্রকল্পের পক্ষে এটিই একমাত্র যুক্তি নয়। একনায়কত্বের তুলনায় গণতন্ত্র পুঁজিবাদকে আরও যে সহায়তা করে, তার উৎস হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যকারিতা। একটি মুক্ত অর্থনীতির অনেকগুলো দিক রয়েছে। আর এ সবগুলো দিকেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সংসদ অথবা প্রতিনিধিত্বশীল কংগ্রেস। এ ভাবেই একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের প্রতিটি দিকেরই কমপক্ষে কিছু কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য হয়ে থাকে। সুস্পষ্ট ও সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি অধিকতর সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে এবং 'সৌভাগ্যের জন্য' একটি ব্যবস্থা হতে অন্য ব্যবস্থা ভালো হতে পারে এই সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সক্রিয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কঠোর ও একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার সম্ভাবনা কমিয়ে দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

একনায়কদের সাধারণত এ ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার প্রবণতা থাকে। আর এ রূপ সিদ্ধান্তের ফলে গৃহীত একটি ভুল পদক্ষেপ অর্থনীতির সফল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকরা তাদের সিদ্ধান্তের পরিণতি মোকাবেলা করতে বাধ্য থাকে। একনায়কদের এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যা তাদের দেশের অর্থনীতির বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে। একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ থাকলে তারা তা করতে পারতো না।

এখন আসল যুক্তিতে ফিরে যাওয়া যাক। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে গণতন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, তবে পৃথিবীব্যাপী লোকজন সে ধরনের গণতন্ত্রকে পছন্দ করে না। কেবল দু'বছর অন্তর ভোটদানই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, জনগণ সে গণতন্ত্র নিয়ে খুশি থাকবে না। তারা দেখতে চায় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। মানুষ কেবল কল্পনাশ্রয়ী ভালো কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। এটিই মানুষের স্বভাব। তারা চায়, পরবর্তী তিন চার বছরে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি। অন্তত ছোটখাটো কিছু উন্নয়ন হলেও। আর তারা এমন এক বাস্তবমুখী নিশ্চয়তা চায় যে, এ ধরনের কিছু উন্নয়ন সত্যিই ঘটবে। এ এমন এক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যা পুঁজিবাদের গোড়াপত্তন করে। অথবা বলা চলে, অন্ততঃপক্ষে একটি গতিশীল অর্থনীতি গড়ে তোলে। আর গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এটি অপরিহার্য। গণতন্ত্র অন্য যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তার মধ্যে এটিও পূরণের ব্যবস্থা করে দেয় পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের জন্যে দ্বিতীয় যে উপকারটি করে তা সবাই ততোটা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। "ফেডারেলিষ্ট" পত্রিকার ১০ ও ৫১তম সংখ্যা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষরা বেশ ভালোভাবেই এটি উপলব্ধি করেছিলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লন্ডনে আর টমাস জেফারসন প্যারিসে পাঠাগারগুলোতে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন, কেন আগের প্রজাতন্ত্রগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। বোঝা যায় যে, ঘৃণার চেয়ে হিংসা দ্বেষ সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে, কারণ ঘৃণা অন্তত দৃশ্যমান, আর সর্বজনীনভাবে একে একটি খারাপ জিনিস বলে চিহ্নিত করা হয়। হিংসাপরায়ণতা খুব কমই স্বনামে কাজ করে। এটি কোন একটি ভালো নামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কাজ করে এবং এটি একটি মারাত্মক অদৃশ্য গ্যাসের মতোই ক্ষতিসাধন করে। পূর্বেকার প্রজাতন্ত্র গুলোতে এই হিংসা এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে লেলিয়ে দিয়েছে, নগরীর একটি গোত্রকে অন্য গোত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এবং এক পরিবারকে অন্য পরিবারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে। আর এ কারণেই আদি আমেরিকানরা বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ("বিভক্ত হলে আমরা শেষ হয়ে যাবো")*। তাঁরা হিংসা দ্বেষকে পরাভূত করতে চেষ্টা করেছেন। একটি প্রজাতন্ত্রে প্রতিহিংসাপরায়ণতা শেষ না হলে, এটি টিকে থাকতে পারে না।

এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষরা ঠিক করেছিলেন যে, একটি প্রজাতন্ত্র যাজক (পাদ্রী) বা অভিজাত শ্রেণী অথবা সামরিক ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে গড়া যায় না (সামরিক ব্যক্তিদের "সম্মানের" প্রতি মোহ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছিল)। তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, একটি প্রজাতন্ত্র গড়তে হবে বেশ নম্র ও সাধারণত যারা নিচে পড়ে থাকে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করে। তাঁরা তাদের প্রজাতন্ত্রকে "বাণিজ্যিক প্রজাতন্ত্র" হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন (আমি যাকে "গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ" বলে আখ্যায়িত করি, সেটিকে আসলে পূর্বপুরুষদের ঐ সংজ্ঞারই একটি সমকালীন প্রকাশ হিসেবে দেখাতে চেয়েছি)। আমেরিকার পূর্বপুরুষরা কেন তাদের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে এমন এক শ্রেণী এবং এমন একটি কাজকে নির্ধারিত করতে চেয়েছিলেন, সর্বজনীণভাবে দার্শনিকগণ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও কবিকুল যাদেরকে ও যে কাজকে নীচ পর্যায়ের এবং অসম্মানজনক বলে চিহ্নিত করে এসেছেন? তাঁরা কেন ব্যবসায়ের মত একটি স্থূল জিনিসকে এ জন্য বেছে নিয়েছিলেন? তাঁরা কেন নীচ প্রকৃতির দাস সুলভ এবং সওদাগরি শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? যারা কিছু স্বকীয়গুণে মূল্যবান, যেমন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পকলাকে সব সময়ই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়ে এসেছে অথবা উঁচু শ্রেণীর লোক, নীচশ্রেণীর লোকদের চেয়ে উন্নত, এটি যেমন ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবর্তে কেন প্রতিষ্ঠাতা-পুরুষরা যে সবের স্বকীয় মূল্য নেই, কেবল উপাদানগত ও ব্যবহারিক মূল্য আছে, সেইগুলিকে নতুন সমাজ নির্মাণের মূলে স্থান দিয়েছেন?

তাঁরা অপেক্ষাকৃত নীচ পর্যায়ের জিনিসকে দুটি কারণে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমত প্রজাতন্ত্রের সব লোক, বিশেষ করে, সমর্থ দরিদ্ররা যদি দেখতে পায় যে, তাদের বাস্তব অবস্থা কার্যত প্রতি বছরই উন্নত হচ্ছে, তখন তারা তুলনা করে দেখতে চায়, তারা আজ কোথায় আছে, এবং আগামীকাল তারা কোথায় পৌঁছতে চায়। তারা প্রতিবেশীদের অবস্থার সাথে নিজেদের

* দরিদ্রের জন্য পুঁজিবাদঃ গণতন্ত্রের জন্য পুঁজিবাদ—মাইকেল নোভাক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার তুলনা করতে চায় না, কারণ তাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য তাদের প্রতিবেশীদের লক্ষ্যের মতো নয়। তারা চায় নিজেদের গতিতে চলে, নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করে আত্মতৃপ্ত হতে।

বস্তুতপক্ষে, টকভিল ও অন্যেরা যেমন উল্লেখ করেছেন, আমেরিকা উল্লেখযোগ্যভাবে হিংসা-দ্বেষ মুক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে জনগণ অন্যদের সাফল্যে আনন্দ বোধকরতো, কারণ এটিকে তারা নিজেদের গ্রাম, নগরী অথবা জাতির আগামী দিনের উন্নতির সংকেত বলে মনে করতো। আজ আমেরিকার সর্বত্র অনেক বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব লোকের প্রতিকৃতি দেখা যায়, যাঁরা জনগণের কল্যাণ সাধন করেছেন এবং যাঁরা বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে অর্থনীতিতে উর্ধ্বমুখী গতির ওপর—এর সামাজিক গতিশীলতা সুযোগ এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টার ওপর। প্রতিষ্ঠাতাপুরুষরা আমেরিকার অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে বাণিজ্য ও শিল্পকে নির্বাচনের তৃতীয় কারণটি হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি দ্বিতীয় বড় হুমকিকে পরাভূত করা। এই হুমকিটি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্যাতন। একজন একনায়ক এককভাবে যতোটা না করতে পারে, তার চাইতে অনেক বেশি নির্যাতন চালাতে ও নিষ্ঠুর হতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। বিশেষ করে ম্যাডিসন এবং হ্যামিল্টন মানুষের ক্ষেত্রে আদি পাপের ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সেই জন্য তাঁরা মঁতেস্কু (এবং একুইনাস) ক্ষমতায় বিভক্তি এবং সেই সাথে সমাজের প্রতিটি শাখায় "বিভাজন নীতি" সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা পোষণ করতেন, তার প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রের প্রকৃতির মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নাগরিকদের বিভিন্নমুখী আগ্রহ নিবদ্ধ করার যথার্থ স্থান। এ সব আগ্রহের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, উৎপাদন, সরবরাহ, পাইকারী ব্যবসায়, খুচরা ব্যবসায়, পরিবহন, কাঠ, তামাক, তুলা, তরিতরকারি, গবাদিপশু, ভেড়া, লোহা, ইস্পাত, কয়লা, তিমি শিকার, কাঁচ, কাঠের জিনিসপত্র, রৌপ্য, বিদ্যুৎ এবং এমনি আরও অনেক কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বাণিজ্য। কাঠামোগত এবং লক্ষ্যের দিক দিয়ে এক শিল্পের আর এক শিল্পের সাথে এক কারখানার সাথে অন্য কারখানার পার্থক্য রয়েছে। ঠিক একইভাবে এটিও বলা চলে যে, ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো একক বা সর্বজনীন অর্থনৈতিক গরিষ্ঠতা স্বাভাবিক নয়।

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার ("জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্যে সরকার")—

Dhaka University Institutional Repository

এর সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে ব্যবসায় ও শিল্প। এর পেছনের কারণগুলো হচ্ছেঃ এই ব্যবসায় ও শিল্প (১) সবার জন্য একটি উত্তম জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করেঃ (২) মুক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে হিংসাকে দমন করে রাখে; এবং (৩) বহু দিকে অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের পীড়ন রোধ করে।

পুঁজিবাদ কী?

আমাদের অধিকাংশ অভিধানই এ ব্যাপারে কার্ল মার্কসের সংজ্ঞা ব্যবহার করে (বাজার বিনিময়ের একটি পদ্ধতি; ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ একত্রিতকরা ও মুনাফা অর্জন)। কিন্তু পুঁজিবাদের প্রতি মার্কসের বৈরিতা জেনেও আমরা কেন তাঁর সংজ্ঞা মেনে নেব, বিশেষ করে, যখন এই সংজ্ঞা সকল অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণসমূহের পরিপন্থী? ম্যাক্স ওয়েবার এবং অন্যান্য অনেক অর্থনীতি বিষয়ক ঐতিহাসিক যেমন উল্লেখ করেছেন যে, আঠারো শতকের শেষ দিকে ইতিহাসে এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে আমরা সেটি গ্রহণ করবো। বাজার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফার বাইরেও এই নতুন ব্যবস্থায় আরও অনেক কিছু ছিল (বাইবেলের সময়েও এ সব ছিল)। এই নতুন ব্যবস্থাটি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে চার্চিল শামপিটার, হায়েক এবং কিজনারের সাথে একমত। কিন্তু চার্চিলের নিজের বক্তব্য হচ্ছেঃ পুঁজিবাদ হচ্ছে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা এমন যথাযথ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং এমন নৈতিক সাংস্কৃতিক পদ্ধতির সহায়ক যার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক সৃষ্টিশীলতার বিকাশ সাধনে বহু ধরনের সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা যায়। মানুষের মননশীলতার সঙ্গে নিবিড় এই ব্যবস্থা যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবনী শক্তি, আবিষ্কার ও উদ্যোগ গ্রহণের। মানুষের অর্থনৈতিক উদ্যোগ যে অনন্য সম্পর্কীয় অধিকার রয়েছে তার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে এই ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন যোগায়।

এই ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্য হবে গোটা মানব দায়িত্বে পরিধিতে প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করা। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার ওপর স্থান পাবে আইনের শাসন এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা। এদের উভয়ের ওপর অগ্রাধিকার রয়েছে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলা। অর্থনীতি একমাত্র এবং সর্বশেষ বিধান নয়, এটি হচ্ছে একটি উপকরণ পদবাচ্য কলা বা মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ধরনের উপকরণ বা মাধ্যম

এটি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রদের জন্যে সর্বোত্তম আশা। গণতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করার জন্যে এ এক প্রয়োজনীয় শর্ত। এটি একটি অতি ছোট বিষয়, কিন্তু গুরুত্ব অনেক।

যদি এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, যদি মধ্য ইউরোপে, যে অঞ্চলে পোল্যান্ড থেকে ইউক্রেন হয়ে বেলারুশ ও রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সে অঞ্চলে এই ব্যবস্থা কার্যকর না হয়, যদি উত্তর এশিয়ায় এটি অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়, তবে একুশ শতকে বিশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি রক্ত ঝরার আশঙ্কা রয়েছে। স্বাধীনতা কখনও কোনো নিশ্চয়তা নিয়ে আসে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের কথায়, এর মূল্য হচ্ছে সর্বকালীন সতর্ক প্রহরা। এর কারণ হচ্ছে কোনো কোনো দিক দিয়ে স্বাধীনতা হচ্ছে সব শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ভঙ্গুর। কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণার ওপর এবং এই ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে থাকার ওপর এর স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্রজন্ম স্বাধীনতা অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে, এর মায়া ত্যাগ করতে পারে অথবা যাদের কাছ থেকে এই স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিল, আবার তাদের ফিরিয়ে দিতে পারে।

এটি হওয়া মোটেও বিচিত্র নয় যে, দুই শতকের সামান্য বেশি সময় ধরে একটি ধূমকেতুর মত ইতিহাসের পরিমন্ডল জুড়ে ধাবমান থেকে এটি নিজে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তখন অবশ্য থাকবে শুধু অন্ধকার। আমাদের ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়াবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শূন্য।

আমাদের এই ভাগ্য অবশ্য রাশিচক্রের গ্রহরাজি স্থির করবে। স্বাধীনতার প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি রয়েছে মানুষের অন্তরে। যদি মনের দিক দিয়ে আমরা আমাদের মৌলিক ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরি এবং আমাদের যে পথ বেছে নেওয়া দরকার সেই পথে যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়, তবে আমাদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের ব্যাট করার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি মুক্ত মানবী ও মুক্ত মানব এই সুযোগই চায়। কোনো গ্যারান্টি চায় না।

এখানে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও জাতিসত্ত্বা ঃ

স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণেই মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণে এবং পেশায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দেশ এবং সামগ্রিক ভৌগলিক অখন্ডতাই একটি স্বাধীন দেশের অবস্থানকে অন্যান্য দেশ বা রাষ্ট্রের সাথে আলাদা করে উপস্থাপন করে। দেখা যায় উল্লেখিত কারণেই মানুষের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্ত্বা বিরাজ করে বা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভৌগোলিক অখন্ডতা বা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে প্রত্যেকটি দেশ বা রাষ্ট্রের একক বা প্রধান জাতিসত্ত্বা স্বীকৃত হয়।

সেই অর্থে জাতিগতভাবে আমরা বাংলাদেশী। ভিন্ন সংস্কৃতির, ধর্ম ও আকার আকৃতি এবং ভাষায় পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের একক ও অভিন্ন জাতিসত্ত্বা রয়েছে। জাতিসত্ত্বা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতিগঠন নিয়েও আলোচনা জরুরী।

জাতি গঠন বলতে অনেক সময় জাতীয় সংহতি বুঝায়। এসম্যানের কথায়, জাতি গঠন হল "এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুপরিকল্পিত উপায়ে এক সুসমন্বিত রাজনৈতিক সম্প্রদায় সংগঠন করা, যেখানে জাতীয় রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান" (The deliberate fashioning of an integrated political community within fixed geographic boundaries in which the nation state is the dominant political institution) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতি গঠন হচ্ছে অন্যতম জটিল সমস্যা, কেননা অধিকাংশই "এখনও জাতিতে রূপান্তরিত হয়নি যদিও তারা জাতিগঠন সম্পর্কে আশান্বিত।"*

এসব দেশে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে আন্দোলনস্বরূপ। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভূমিকা এর ছিল না। পাশ্চাত্যে 'এক ভাষা এক কৃষ্টি' জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু নতুন দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়েছে ভিন্নমুখী সামাজিক সাংস্কৃতিক ভূমিতে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি ও ভাষা বিভিন্ন জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি কল্পে কার্যকর হয়নি। বিভিন্ন কুলভিত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক গ্রুপ বা গোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে এসব নতুন

* Rupert Emerson, From Empire to nation (Boston: Beacon Press, 1960), p-94

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহু জাতীয় ও বহু গোষ্ঠীর সমস্যা। রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান গ্রুপ বা গোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে এসব নতুন রাষ্ট্রে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহু জাতীয় ও বহু গোষ্ঠীর সমস্যা। রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান গ্রুপ বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তা একদিকে যেমন স্তরভিত্তিক (vertical), যেমন শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তেমনি আনুভূমিক (horizontal), যেমন বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গ্রুপের মধ্যে সংঘাত বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গ্রুপের মধ্যে সংঘাত। এসব সমাজে অধিকাংশ জনগণের আনুগত্য জড়িত রয়েছে ক্ষুদ্রতর প্রত্যক্ষ এককের প্রতি, বৃহত্তর একক রাষ্ট্রের প্রতি নয়।

এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপ থেকে স্বতন্ত্র করবার জন্য যে সব উপাদান কার্যকর ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর ঐসব উপাদান আরও শক্তিশালী হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণ অতীতের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সম্পর্কে প্রত্যেক গ্রুপ ও গোষ্ঠীকে সচেতন করেছে আর তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাদের এক গর্ববোধ জাগ্রত করেছে। স্বাধীনতার পরও এসব গ্রুপ কোন্দল ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে ও ভবিষ্যৎ সুখের ভিত্তি সুদৃঢ় করে কালক্রমে এ দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্ষম, কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ অল্প সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংহতি দূর করতে সক্ষম হয়নি। তাই এসব নতুন দেশের নেতৃবর্গের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের "আদিম অনুভূতিগুলোকে" (primoridal sentiments) "পৌর অনুভূতিতে" (civil sentiments) রূপান্তরিত করা, সংকীর্ণ একাত্মবোধের উর্ধ্বে এক জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা আর বহু সংখ্যক গ্রুপ ও গোষ্ঠীর উর্ধ্বে এক জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা।

এক অর্থে জাতিগঠন উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই শুধু যে প্রযোজ্য তা নয়, উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তবে পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশপাতাল প্রভেদ। উন্নত দেশে এর জন্য অবকাঠামো (infrastructure) আগেই তৈরি হয়েছে। ঐ সব দেশের সমস্যা হচ্ছে যে সব "গ্রুপ বা গোষ্ঠী এখনও বিদ্যমান কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ হয়নি" (not yet integrated groups) তাদের সংহত করা। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সর্বপ্রথম জাতীয় সংহতির অবকাঠামো রচনা করতে হবে, তারপর বিভিন্ন গ্রুপকে জাতীয় মোজায়েক (mosaic) সম্মিলিত করে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

জাতিগঠন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর শুরু আছে, নেই কোন সমাপ্তি। এটা ক্রমবর্ধমান ধারায় পরিপূর্ণতা অর্জন করে। তাছাড়া, জাতিগঠন হচ্ছে একটা বহুমাত্রিক (multi-dimensional) সমস্যা। মাইরন ওয়েনারের (Myron

Dhaka University Institutional Repository

Weiner) মতে, জাতিগঠনের অন্তর্ভুক্ত হল পাঁচ ধরনের প্রচেষ্টা। জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (establishment of national authority) ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো (creation of a sense of territorial nationality) জনসাধারণ ও এলিট গ্রুপের মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণ (elimination of the mass-elite gap) সর্বনিম্ন পর্যায়ে মূল্যবোধ ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা (creation of the minimum value consensus) আর সংহতি বৃদ্ধিকল্পে প্রতিষ্ঠান রচনা (building of integrative institution) হচ্ছে জাতিগঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতিগঠন অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে, কারণ এসব দেশের নেতৃবর্গকে একই সাথে জাতিগঠন (national building) ও রাষ্ট্র গঠনের (state building) কাজে হাত দিতে হয়। কোন কোন সময় এ দু'ধরনের কাজ পরস্পরকে সহায়তা করে, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তারা হয়ে ওঠে বিপরীতধর্মী। রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় কর্তৃত্বব্যঞ্জক শাসন কাঠামো গঠনের, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ আর সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ। জাতি গঠনের জন্য কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে কর্তৃত্বের ব্যাপক ব্যাপ্তি আর দায়িত্বশীলতা ও অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতি গঠনের কাজ তিনটি কারণে অবহেলিত হয়। প্রথম, এসব দেশের নেতৃবর্গকে একই সাথে জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে হাত দিতে হয়। দ্বিতীয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্নটি বিরাট আকার ধারণ করে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতৃবর্গ জাতি গঠনের পরিবর্তে রাষ্ট্র গঠনের দিকেই মনোযোগ দেন। তৃতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে উপনিবেশ উত্তর রাষ্ট্রে (post-colonial), যে সব সরকারী কাঠামো বিদ্যমান তার ফলে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে অতি সহজে। ফলে জাতি গঠন অবহেলিত হয়ে ওঠে।

কিভাবে জাতি গঠন সম্ভব? এর কোন সহজ উত্তর নেই আর নেই কোন আদর্শ সমাধান। অনেক লেখক অত্যন্ত হতাশ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, "গত পঞ্চাশ বছরে যে সব নতুন নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতি গঠনে সক্ষম হবে না।"* ফলে ক্ষমতা দখল, বিদ্রোহ আর যুদ্ধ এসব ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এত হতাশ হবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। জাতিগঠন এক অসম্ভব প্রক্রিয়া নয়, যদিও তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আর জাতীয় সংহতি অর্জন করতে হলে এসব দেশের শাসনকারী এলিটদের উচিত, রাষ্ট্র গঠন (state building) ও জাতিগঠনমূলক (nation building) কার্যক্রমের এক গতিশীল সামঞ্জস্য বিধান করা। অন্য কথায়, ক্ষমতার

*Joseph R. Strayer, "The Historical Experience of Nation Building in Europe". In Karl W. Deutsch and W... J. Foltz, eds. Nation Building (Newyork: Atherton Press, 1963), p 26

Dhaka University Institutional Repository

সমাবেশের সাথে শাসকদের দায়িত্বশীলতার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে আর কর্তৃত্বব্যঞ্জক শাসন কাঠামোর সাথে জনগণের অংশগ্রহণের সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

আবার বলা যায় যে, ভারতে বিভিন্ন জাতি রয়েছে কিন্তু তারা সবাই ভারতীয়। বিভিন্ন আদিবাসী যেমন দিনাজপুরে, রংপুরে, ময়মনসিংহে, সিলেটে যে সকল রাখাইন, মুরং, খাসিয়া প্রভৃতি আদিবাসী রয়েছে তারা সকলেই বাংলাদেশী। এখানে পৃথক জাতিসত্ত্বা বা ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহীতারই সামিল বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রত্যেকটি দেশের মানুষেরই রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। ধর্মের প্রতি প্রত্যেকের শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা থাকা একটি সুন্দর সমাজের জন্য জরুরী। তবে প্রধান জাতিসত্ত্বা বা ভৌগলিক অবস্থান বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে নয়।

এখানে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে সামাজিক বিভেদ দূর করার পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্যকে লালন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী ও গণমাধ্যম

জনসংযোগ ও প্রচার

ভারতে ও বাংলাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় জনসংযোগ ও প্রচার-তৎপরতা এখনও শৈশব অবস্থায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংযোগ ও প্রচার বিশেষ পেশায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দক্ষিণ আমেরিকায় জনসংযোগ ও প্রচার বিজ্ঞাপন তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে উল্লেখিত তৎপরতার সম্ভাবনা এখনও স্বীকৃত হয়নি বলা চলে।

ফলে উন্নয়ন, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সঙ্গে জনসংযোগ ও প্রচারের সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। এ জন্যে সাংবাদিকতার সঙ্গে আনুষঙ্গিক তৎপরতাসমূহের মধ্যে পার্থক্য কি তা নীচে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসাধারণকে আকর্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লেনদেন তথা বিক্রি বাড়াবার কর্মপ্রক্রিয়াকেই উন্নয়ন (promotion) বলা যায়।

প্রচারণা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ইনস্টিটিউট প্রণীত প্রচারণার (propaganda-র) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ "পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির অভিমত বা কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসে কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির অভিমত প্রকাশ বা তৎপরতাকে প্রচারণা বলা হয়।"*

জনসাধারণ বা কিছু বিশেষ জনসমষ্টিকে কিছু বাস্তব তথ্য ও মতামত জানিয়ে দেওয়ার জন্যে এবং এভাবে ঐ তথ্য ও মতামত প্রচারের জন্যে যোগাযোগ স্থাপনকে 'প্রচার (publicity)' বলা যেতে পারে। প্রচার জনসংযোগের একটি হাতিয়ারস্বরূপ।

জনসংযোগ সংক্রান্ত বিষয়ের লেখক জেরল্ড এস. বেস্কিন (Gerald S. Beskin) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জনসংযোগ (public relation) মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান।

'সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা (press agentry)', মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান। তবে প্রচারের অনেক কিছুই এর অঙ্গীভূত। তাছাড়া, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চমক (stunt) এর ব্যবহার কিছুটা এর আওতাভুক্ত।

* Public Relations and Publicity-রোল্যান্ড ই.উইলসনে

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞাপনকে প্রধানত বেতার, সংবাদপত্র, সাময়িকী, বিলবোর্ড, প্রাচীরপত্র, এবং ছোট ছোট হ্যান্ডবিলের কথন ও মুদ্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় বলা যায়। ডক্টর লরেন্স আর, ক্যাম্পবেল (Dr. Laurence R. Campbell) এর ভাষায় বিজ্ঞাপন আস্থা, পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের বাণিজ্যিক বার্তাবিশেষ। এ বিষয়ে অন্যত্র আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

জনসংযোগ

যাঁরা জনসংযোগের কাজে নিয়োজিত তাঁরা জনসাধারণ বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার একটা বার্তা, বিশেষ করে আস্থা স্থাপনের যোগ্য বার্তা চান। তাঁরা তাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের তৎপরতা সংগঠিত করেন। যাঁরা একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা করেন (চাকরি করেন) এবং যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা লাভ করে থাকেন তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক কি এটা তাঁরা বুঝতে চান। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পারিপার্শ্বিকতার উপর কি প্রভাব ফেলেছে, সে সম্পর্কে সচেতন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, সরকারি নীতি জনসাধারণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সরকারের তা জানা দরকার। যদি ঐ নীতি মূলত সুষ্ঠু ও নিখুঁত না হয় তাহলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনমনে যে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নেবে তাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি ব্যর্থতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মতো যে কোনো সরকারই চান সকল নির্বাচন এলাকার লোকই (যেমন ব্যবসায়ে মক্কেল বা গ্রাহক) সন্তুষ্ট থাকুক। এই সরকারের সঙ্গে অন্যান্য সরকারেরও সম্পর্ক ভালো থাকুক। অন্য কথায়, সরকার বিভিন্ন জনসাধারণের নিকট নিজেরই অনুমোদন চান।

এ ধরনের অনুমোদন শুধু সতর্কতার সঙ্গে প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনসমষ্টিকে এসব নীতি ও পরিকল্পনার বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাই হচ্ছে জনসংযোগমূলক তৎপরতা। জনসংযোগ উপদেষ্টা বা পরিচালকগণ এই তৎপরতা পরিচালনা করে থাকেন। জনসংযোগ বিভাগে প্রচার, সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা, বিজ্ঞাপন উন্নয়ন প্রচারণা এর সব কিছুই কাজে লাগানো হয়। তাছাড়া সাংবাদিকতার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেমন, সংবাদ কাহিনী তৈরি করে পাঠানো হয়, বিশেষ ধরনের সাময়িকী ও সংবাদপত্র সম্পাদনা করা হয়, পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র লেখা হয় এবং বেতারে প্রচারের উপযোগী লেখা তৈরি করা হয়। ভারতের মোটামুটি এর সব কিছুই সীমিত আকারে

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন করা হয়ে থাকে। ভারতে বেতার সরকারি মালিকানাধীন বলে এ কাজে বেতারকে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া, মূল্য বা রাজস্বের বিনিময়ে বেতার বিজ্ঞাপনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রধানত বহু ভাষার অস্তিত্বের কারণে।

ভারতে ও বাংলাদেশে প্রচার-তৎপরতা

ভারতে প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে প্রচার-তৎপরতার উন্নতি হয়েছে (এক) বিরাট সরকারি সংগঠনে ও (দুই) বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ভারতে রাজধানী দিল্লীতে, প্রচার ও তথ্য কার্যালয়গুলো প্রদেশে, সংশ্লিষ্ট প্রচার কার্যালয়গুলো বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং একই ধরনের প্রচার প্রতিষ্ঠান বড় বড় কর্পোরেশনের প্রচার তৎপরতা পরিচালনা করে থাকে। অনেক বড় শহরে বেসরকারি প্রচার প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠান তাদের বেশির ভাগ সময় ও দক্ষতা রাস্তায় রাস্তায় মাইক্রোফোন ও গান বাজনা সহকারে ছায়াছবির প্রচার, প্রাচীর-পত্র লাগানো ও মূল্য পরিশোধকৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচারে নিয়োজিত রাখে। অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্যগুলোর (প্রদেশ) সরকারি প্রচার বিভাগ যে সব কাজ করে থাকে সে সবই হচ্ছে সরকারি প্রচার-বিভাগের গতানুগতিক কাজ। সাংবাদিকতার এ ধরনের কাজে কোনো কোনো প্রচার বিভাগের অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরেরও বেশি।

সরকারি প্রচার বিভাগের প্রধান কাজ সাধারণত বিভিন্ন সরকারি বিভাগের তথ্য সাধারণ্যে প্রচার করা। হায়দারাবাদের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভাষায় ঃ "এ ধরনের একটি বিভাগের কাজ হচ্ছে সংবাদপত্র ও অন্যান্য লভ্য গণ যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরভাবে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে প্রচার বিভাগ সরকারি নীতির প্রশ্নে জনগণের মনোভাব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কেও সরকারকে অবহিত রাখেন। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রচার বিভাগ সংবাদপত্রের মতামতের গতি প্রকৃতি, দলীয় নীতি ও জন আন্দোলনের বিষয় পর্যালোচনা করে এবং সরকারের নেওয়া মূল কর্মসূচী ও পাল্টা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও সময় নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে এবং বিভ্রান্তি ব্যক্তিদের মতামত বা প্রচারণাকে সুস্থ ও গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করে জনসমর্থন গড়ে তুলতে ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের শুভেচ্ছার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচার বিভাগ প্রেসনোট, সংবাদ ইশতেহার (press communique) বেসরকারি বিজ্ঞপ্তি, নেপথ্য তথ্যাদি, কাহিনী নিবন্ধ, প্রচার পত্র, পুস্তিকা, রিপোর্ট, আলোকচিত্র, ব্লক ও আরও অন্যান্য উপকরণ সংবাদপত্র এবং উপযুক্ত শিক্ষাবিদ, লেখক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করে। তাছাড়া, এই বিভাগকে বিশেষ তথ্য সরবরাহের জন্যে অজস্র অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। এছাড়া দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক ঘটনাপ্রবাহ ও জনসংযোগ সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারি কর্মকর্তাদের দেখার জন্য তৈরি করা হয় এই বিভাগে।

সরকারি তৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরের কাটিং রাখতে ও তার গ্রন্থনা কাজেও অনেক সময় ব্যয় হয়। দেশী ভাষায় প্রকাশিত অনুরূপ খবরাখবর অনেক সময় ইংরেজিতে অনুবাদ করাও জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।

প্রচার বিভাগকে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়। প্রেসকক্ষ ও গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হয়। তাছাড়া একটি চলচ্চিত্র শাখাও পরিচালনা করতে হয়। এ শাখা গ্রামে বিভিন্ন ধরনের গণ-জমায়েতের সামনে দেখানোর জন্যে ছায়াছবি নির্মাণ করে, মূল্য পরিশোধকৃত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, বেতার কথিকার ভাষ্য তৈরি ও প্রচার করে, সংশ্লিষ্ট শহর বা প্রদেশে সফরে আগত অতিথিদের সুখ সুবিধা নিশ্চিত করে এবং সম্মেলন, প্রদর্শনী ও কমিটিসমূহের বিষয় সীমিত আকারে বেসরকারিভাবে প্রচার করে।

সরকারি জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ যখন এসব কাজে এক ডজনেরও বেশি নিজস্ব সার্বক্ষণিক কর্মচারী নিয়োগ করে, তখন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঐ একই ধরনের সেবা লাভের জন্যে হয় নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং বড় বড় শহরে ও সদর কার্যালয় এলাকায় শাখা অফিস চালু করে, আর তা না হলে সাংবাদিকতা সুলভ কাজে বিশেষজ্ঞসুলভ দক্ষতাসম্পন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করে।

এ বিষয়ে ভারত সরকারকেই সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। কারণ, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আটটি শাখা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ কাজ করার জন্যে। সেগুলো হচ্ছেঃ অল ইন্ডিয়া রেডিও, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, প্রকাশনা বিভাগ, চলচ্চিত্র বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও দর্শনমূলক প্রচার দফতর, গবেষণা ও রেফারেন্স বিভাগ, ফিল্ড বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও দর্শনমূলক প্রচার দফতর, গবেষণা ও রেফারেন্স বিভাগ, ফিল্ড পাবলিসিটি দফতর এবং সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার জন্যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীগণকে নিযুক্ত রাখা হয়। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর শাখা কার্যালয় প্রায় ১২টিরও বেশি শহরে রয়েছে। নয়াদিল্লী, জলন্ধর, শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কার্যালয় রয়েছে। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজধানীতে ব্যুরোর আরও কিছু অফিস পরিচালিত হয়। ব্যুরো ১৩টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করে থাকে। শুধু ভারত সরকারই নয়, জাতিসংঘ ও অন্যান্য ৯টি দেশ সাধারণত বোম্বাই বা নয়াদিল্লীতে এবং তাদের কনসুলেটগুলোর সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে তথ্য কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে।

ভারত ও বাংলাদেশের মত অনেক দেশে প্রচার ও জনসংযোগের কাজ একটি বিভাগের মতো বিরাটকায় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান করে থাকে। ভারতের ১১৭টি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমপক্ষে ১৭টি প্রতিষ্ঠান প্রচার ব্যবসায়ে জড়িত। তা ছাড়া হিসেবের বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠান প্রচারের কাজ করে থাকে। এরা সকলেই জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কৌতুহল বা আগ্রহ সৃষ্টিতে আগ্রহী কিংবা কিছু বিশেষ কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনা করতে আগ্রহী এবং বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ ধরনের কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের জনসংযোগ অফিসার উল্লেখ করেছেন যে তাঁর মতে জনসংযোগ এর চারটি মূলনীতি রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

"আপনাকে আপনার গ্রাহকের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাই আপনাকে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। আপনাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একাকী কাজ করতে জানতে হবে।" তিনি আরও বলেছেনঃ "প্রত্যেক ব্যবসায়ের সঙ্গেই কিছু না কিছু লোক জড়িত। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক জনসংযোগ কার্যে জড়িত– তা তিনি পছন্দ করুন বা না-ই করুন। যদি একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয় তা হলে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে বিভিন্ন লোকজনের উপর এ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।"*

ঘরোয়া প্রকাশনা

ঘরোয়া-প্রকাশনা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উভয়ের জনসংযোগ তৎপরতায় সুস্পষ্ট অন্যতম প্রধান সাংবাদিকতামূলক হাতিয়ার। ঘরোয়া প্রকাশনা প্রকাশে সাংবাদিক সুলভ কর্ম প্রতিভা, বিশেষ করে লিখন, সম্পাদন ও আলোকচিত্রবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। ত্রিচুরাপল্লীতে

* এম.আর.পাই (সম্পাদক) 'ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস গাইড' বোম্বাই কলেজ অব জার্নালিজম, বোম্বাই, ১৯১৬, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ঘরোয়া সাময়িকী প্রদর্শনীতে এসব প্রকাশনার একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সংজ্ঞায় বলা হয়, "শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-সংগঠন, জনসংযোগমূলক সংস্থা বা বাণিজ্য সমিতি, নিজ কর্মচারী, সদস্য বা গ্রাহকদের জন্যে যে প্রকাশনা মুনাফার উদ্দেশ্য সামনে না রেখে প্রকাশ করা হয় তাই ঘরোয়া প্রকাশনা।"

এ ধরনের প্রকাশনা সংবাদপত্র বা সাময়িকী যে কোনো আকারই হতে পারে। এই প্রকাশনা আবার অন্তমুর্খী ও বহির্মুখী দু'রকম হতে পারে। ঘরোয়া প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং বহুমুখী প্রকাশনা ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যবহারকারী, সম্ভাবনাময় গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যের নিকট পাঠানো হয়। কখনও আবার এই দুই ধরনের প্রচার একই প্রকাশনায় করা হয়ে থাকে।

ভারতের এ ধরনের প্রকাশনার সংখ্যা একশর মতো। তাই সাধারণ লোক এসব প্রকাশনা সম্পর্কে বড় একটা জানেন না। তাছাড়া এগুলো যারা পড়েন তাদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে একটা কথা উল্লেখ করার মতো যে, ঐ মাত্র একশটির মতো প্রকাশনার মধ্যে এমন কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে যা বিশ্বের যে কোনো স্থানের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার সমতুল্য।

ভারতে ব্যবসায় ও শিল্প তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও এ ধরনের কাগজ ও সাময়িকী প্রকাশিত হবে। অন্যান্য দেশেও শিল্প অগ্রগতি অনুযায়ী এ ধরনের প্রকাশনা রয়েছে। অতীতে যখন ব্যবসায়ের অবস্থা ভালো থাকতো তখনই এসব প্রকাশনার প্রসার ঘটতো, আবার ব্যবসায়ে অবনতি দেখা দিলে এসব প্রকাশনাও উধাও হতো; কার্যতঃ এ ধরনের প্রকাশনা তখন ব্যয়বিলাস হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে এসব প্রকাশনার অস্তিত্ব অব্যাহত রয়েছে। কারণ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসংযোগ রক্ষার কাজে এসব প্রকাশনার কার্যকর ভূমিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি, গ্রাহক বা ব্যবসায়ীর সুসম্পর্ক স্থাপন এবং আরও বেশি পণ্য বিক্রির বিষয়ে ব্যবসায়ী ও পরিবেশকদের সহায়তা করাই এসব প্রকাশনার প্রধান উদ্দেশ্য।

এ ধরনের পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনসংযোগ ও প্রচারের মূলনীতি অনুধাবন করা দরকার ও সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রকাশনার মতো এ ক্ষেত্রেও সাংবাদিকতা পেশাসুলভ দক্ষতারও প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের ও নিবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনার জন্যেও প্রতিবেদক ও লেখকের প্রয়োজন। সাময়িকী বা পত্রিকার বিষয়লিপিগুলো সম্পাদনা ও ব্লক তৈরীর জন্য আলোকচিত্রগুলোর যথাযথ নির্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্পাদকেরও প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিচুরাপল্লীতে দি সাউথ মাদ্রাজ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রচার কর্মকর্তা আর. পার্থ সারথী একটি প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ঘরোয়া প্রকাশনাকে নৈতিক প্রেরণা এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির একটি শক্তি ও কারিগরি তথ্যাদি প্রচারের অমূল্য হাতিয়ার বলে বর্ণনা করেন।

তিনি তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা 'ইলেক্টোলাইট' এর প্রসঙ্গে বলেন, "যদি জনসাধারণের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও উজ্জ্বল আনন্দাভা বিকিরণকারী এ ছোট আলোকময় বৈদ্যুতিক বাতির পেছনের ইতিহাস কি জানেন—যদি জানেন ঐ আলোর নেপথ্যে অন্য কোথাও ইন্ধন যোগানোর কাজ চলছে এবং যদি আমাদের নিজ কর্মীরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন, তাদের সুখ দুঃখ বেদনা উপলব্ধি করার মতো একটা মাধ্যম রয়েছে তা হলে আমাদের এই সাময়িকীখানি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে তা বোধ করি বলা যাবে না।"

ভারতের ঘরোয়া প্রকাশনাগুলো সাধারণত চার পাতার সংবাদপত্র অথবা ৩২ থেকে ১০৪ পাতার চার বর্ণে ছোট সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় হচ্ছে বোম্বাই এর সদর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ৪৮ পাতার অভ্যন্তরীণ প্রকাশনা বার্মা-মেল নিউ। প্রকাশনাটিতে উঁচুমানের কাগজ, ব্লক ও মুদ্রণের সমাবেশ রয়েছে। তা ছাড়া, এতে বিশেষ নিবন্ধ ও সারা ভারতে বার্মা মেল কর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতার সংবাদও ছাপা হয়ে থাকে।

'ভানলপ গেজেট'ও একইভাবে উন্নতমানের পত্রিকা। এর সুনামও বহুদিনের। কোলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মুদ্রণ শৈলী অত্যন্ত আধুনিক। এতে ভানলপের তৈরি পণ্যের ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধও ছাপা হয়। অন্যান্য নামকরা প্রকাশনাগুলো সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'মার্টিন বার্ন হাউস ম্যাগাজিন', 'স্টানভ্যাক ম্যাগাজিন', 'টেলকো নিউজ', 'দি রাইন্ডেল', 'ইন্ডিয়া লিংক', 'পরিচয়', 'ম্যাজিক কার্পেট', 'সেন্ট্রাল রেলওয়ে ম্যাগাজিন', এবং 'এস.আই.আর.ডি (SIRD) নিউজলেটার।'

ভারতে সাধারণত সংবাদপত্রসমূহের তুলনায় এ ধরনের বিশেষ সাংবাদিকতার তৎপরতা তুলনামূলকভাবে সীমিত। তবে, এর বিকাশের লক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডিটর্স' গঠিত হয়েছে এবং এর নিজস্ব একটি প্রকাশনাও রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৩-এ। এর মধ্যে ৫৫টিই হচ্ছে ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সাময়িকী; প্রতিষ্ঠানটি 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডিটর্স' এর সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ মুদ্রণ

পাশ্চাত্যের নিয়ম অনুযায়ী ভারতেও বলতে গেলে একইভাবে সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। এর কারণও খুব স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য থেকে আগত ব্যক্তিগণই এ দেশে মুদ্রণ শিল্পের উদ্যোক্তা। মিশনারিরাই (খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক) ছাপাখানা স্থাপনের কাজে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন। পরে ব্যক্তিগত ও রাজকর্মচারী পর্যায়েও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তবে, ব্যক্তিগত ছাপাখানাগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষোক্ত ছাপাখানাগুলো আমলাতন্ত্রের চাহিদায় যোগান দিতে অস্তিত্ব বজায় রাখে। ভারতের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিলো বলে মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দেশ পাশ্চাত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ভারতে এ কথা সানন্দে ও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং তার কিছুদিন পরেও সংবাদপত্র, পত্রিকা বা সাময়িকীর মুদ্রণে গ্রাহকের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে প্রদর্শন-কলা (display) প্রয়োগের কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি। সে সময় সংবাদের মূল পাঠে (tex-এ) ব্যবহৃত জ্যেষ্ঠাক্ষরসমূহ (capital letters) স্তম্ভের উপর সাজিয়ে প্রধান শিরোনাম দেওয়ার কাজ চালানো হতো। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রদর্শন-কলার বিকাশও হয়েছে খুব ধীর গতিতে। আজও পত্রিকা ও সাময়িকীতে আগেকার দিনের মতো সাদামাটা ছাপার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রদর্শন সৌষ্ঠব খুব একটা ফলাও করে করা হয় না এবং বিশেষ করেক শ্রেণীর টাইপের মধ্যেই মুদ্রণ সীমিত রাখা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রাচীন মহাদেশীয় আকৃতির সুন্দর অক্ষরসমূহের পুনর্জাগরণ (renaissance of old containetial faces) টাইপের আধুনিক শৈলীর ব্যাপক প্রভাব সেই সঙ্গে অভিনব প্রদর্শন-কলা মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছে। সংবাদসুলভ প্রদর্শন কৌশলের কল্যাণে প্রধানত এই ঈপ্সিত পরিবর্তন সম্ভব হলেও মাঝে মাঝে আবার যখন এই দায়িত্ব প্রদর্শন কুশলীর (display man-এর) উপর এককভাবে অর্পিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর বিবেচনা শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, এর ফল ভালো না হয়ে উল্টোটাই হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকার অনুসৃত ও প্রদর্শন কৌশলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। প্রধান সংবাদ কাগজের প্রথম পাতায়, প্রধান নিবন্ধ (leading articles) দুই-এর পাতায় বামদিকে, খেলাধূলার খবর শেষে, ছোট ছোট বিজ্ঞাপন তিন এর পাতায় সবই পাশ্চাত্য কাগজের মতোই ছাপা হয়। তবে এ সত্ত্বেও কিছুটা তারতম্য হতে পারে। সেটা নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের উপর। তাঁরা তাদের গ্রাহকদের আকর্ষণের একটা বিশেষ উপায় হিসেবে বৈচিত্র্য আনার ব্যবস্থা করতে পারেন।

মুদ্রণ

এক বা একাধিক ভাব বা ভাবনিচয়ের (ideas-এর) বোধগম্য ও আকৃতিগত প্রকাশের বৈচিত্র্যময় মাধ্যমই হচ্ছে মুদ্রণ। মুদ্রণ এমন প্রতীকী-প্রকাশ যার মাধ্যমে শব্দকে প্রকাশ করা যায় না, ঐ শব্দের বিকল্প প্রতীক প্রকাশ করা যায়। মুদ্রণ একটি বিশেষ কোনো বস্তু বা ঘটনার বাস্তব ছবি দিতে পারে না, তবে অঙ্কন ও বর্ণনার মাধ্যমে ঐ বস্তু বা ঘটনাকে স্থায়ীভাবে 'স্মৃতি' হিসেবে সংরক্ষণের সামর্থ্য রাখে। চিত্রণ বা অঙ্কনের সমতুল্য ভূমিকা পালনের যোগ্যতা মুদ্রণের নেই, তবে লাখ লাখ মানুষ যে ছবি বা খোদাই কর্ম কখনও দেখেনি বা সাধারণত তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, মুদ্রণ বর্ণনার মাধ্যমে ঐ ছবি বা খোদাইকর্মের একটা মানসচিত্র তুলে ধরা সম্ভব। এ কারণে মুদ্রণ হচ্ছে এমনিভাবে ভাব-বিন্যাসের (অক্ষরের মাধ্যমে) কৌশল যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাব-বিন্যাসের জন্যে আবার এক বা একাধিক রীতিতে বা পদ্ধতিতে মুদ্রণ করা হতে পারে।

মুদ্রণশৈলীর একটা বিশ্বজনীনতা আছে। এ জন্যে এক দেশে যা ভালো ছাপা হিসেবে বিবেচিত অন্য দেশেও তা ভালো ছাপা হিসেবে বিবেচিত হয়। যে কোনো সুপরিকল্পিত মুদ্রণ বিন্যাস সংবলিত সংবাদপত্র যে কোনো ভাষায় সুপরিকল্পিত মুদ্রণ বিন্যাস সংবলিত সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই ভালো মুদ্রণ বা ছাপার কোনো আঞ্চলিক বা জাতীয় সীমারেখা নেই। ভাষার অক্ষর আলাদা হতে পারে, তবে ঐ অক্ষরসমূহ ছাপার আকারে প্রকাশের যে মান নির্ধারিত রয়েছে তা আন্তর্জাতিক।

এ ছাড়াও, মুদ্রণের সঙ্গে আরও কিছু বিষয় জড়িত। ছাপার জন্যে যে সব মেশিনপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা মূলত এক। এগুলির আকারেই শুধু বাহ্যিক পার্থক্য থাকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কার্যত একই ধরনের মেশিনপত্রের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অক্ষর সাজানো হয়। সর্বত্রই ছাপার কাজে কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিরোনামের অক্ষরসমূহের আকার মূল পাঠের চেয়ে বড় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণ পর্যায়

মুদ্রণ বলতে কি বোঝায় তা জানা হল। কিন্তু যে প্রশ্ন রয়ে যায় তা হচ্ছে মুদ্রণ কিভাবে সম্পন্ন হয়? ধরা যাক, একটা নিবন্ধ পাওয়া গেল এবং তা ছাপার জন্যে মনস্থির করা হল। নিরন্ধটির অবর-সম্পাদনাও শেষ হয়েছে এবং অক্ষর সাজানোর জন্যে তা তৈরি। আরও ধরা যাক, এই নিবন্ধনের দুটি প্রধান অংশ আছে, শিরোনাম আছে, সম্ভবত উপশিরোনামও আছে, সর্বোপরি মূলপাঠসহ একটা ভূমিকাও দেওয়া আছে। মুদ্রণ পরিকল্পক (lay-out man) সাময়িকী বা সংবাদপত্র যাই হোক না কেন তাঁর পত্রিকার অঙ্গসজ্জাশৈলী সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। তিনি তাঁর পত্রিকার অঙ্গসজ্জাশৈলী অনুযায়ী শিরোনাম সাজান এবং কি পদ্ধতিতে ও কোন আকারের অক্ষর তাতে ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করেন।

সংগৃহীত সাময়িকীগুলো দেখা যেতে পারে। তাতে কত রকমের কত বৈচিত্র্যময় মুদ্রণ পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। এ জন্যে, মুদ্রণ পরিকল্পকের কাজের আওতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকলেও দু'জন মুদ্রণ পরিকল্পক কখনই ঠিক একই রকমের মুদ্রণ পরিকল্পনা তৈরি করবেন না, তাদের কাজের মধ্যে কিছু না কিছু তারতম্য থাকবেই।

প্রতিটি সাময়িকীর মুদ্রণ পরিকল্পনায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এ রকম বৈশিষ্ট্য থাকাও উচিত। যদি কোনো সাময়িকীর এমন বৈশিষ্ট্য না থাকে তা হলে মুদ্রাকরের হাতে ঐ সাময়িকীর এতিম দশা হতে বাধ্য। আর মুদ্রাকর অভিজ্ঞ ও দক্ষ না হলে তো কথাই নেই, সে ক্ষেত্রে দুর্গতির চরম হওয়াটাই একান্ত প্রত্যাশিত।

নিবন্ধখানির শিরোনামের জন্যে ব্যবহার্য টাইপ যখন নির্ধারণ করা হয়, কম্পোজিটার যখন ঐ টাইপের অক্ষর সাজায় এবং নিবন্ধের মূল পাঠখানির অক্ষর সাজানো হয়, তখন আকর্ষণ বৃদ্ধি ও পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যে অনুচ্ছেদ শিরোনামও (paragraph beading-ও) দেওয়া হয়।

এভাবে, নিবন্ধটির পুরোটাই ছাপা হয় এবং প্রথম প্রুফ বের করে নেওয়া হয়। পরে সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে, সাময়িকীর যে পাতায় নিবন্ধটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছাপা হবে সেই পাতায় (নিবন্ধটি ছাপার জন্যে পুরো একপাতা জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে অবশ্য খুবই ভালো হয়) পুরো নিবন্ধটি বসিয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকীটি যদি বেশ বড় আকারের হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে নিবন্ধ ও ছাপার অন্যান্য বিষয়ের একটা মুদ্রণফলক (stereo) তৈরি করা হয়। এই মুদ্রণফলকটির আকার বেশ বড় ও

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধচন্দ্রাকার এবং সাময়িকীর একটি পৃষ্ঠার উপকরণ এতে থাকে। ফলকটিকে ঠিক করে নেওয়ার পর তা মুদ্রণযন্ত্রের সিলিন্ডারের চারপাশে ঘুরিয়ে স্থাপন করা হয়। সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে, মেশিন ঘুরলেই নিবন্ধটি ঝকঝকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে। ছাপা শেষ হওয়ার পর পরই বড় যন্ত্রে কাগজগুলোকে ভাঁজ করা হয় এবং বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়।

এই হলো পাণ্ডুলিপি থেকে পূর্ণাঙ্গ সাময়িকীতে নিবন্ধ ছাপার এবং তা পাঠকের নিকট পৌছে দেওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। আজকাল মুদ্রণের ব্যাপারটি ক্রমশঃই যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অবশ্য উর্দু ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর লেখা সবই হাতের লেখা এবং লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপা হয়। তবে হাতের লেখার পরিবর্তে মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের ব্যবহার আস্তে আস্তে ব্যাপকতা লাভ করছে।

যান্ত্রিক অক্ষর সজ্জার (mechanical type setting-এর) প্রচলনের পর থেকে অন্যান্য ভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে যান্ত্রিক অক্ষর সজ্জা চালু হচ্ছে। হিন্দি ভাষার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার দরুণ অক্ষর সজ্জার সময় এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পাওয়ায় পত্র পত্রিকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালে বহু প্রাচীন অক্ষর তৈরি ও ঐসব অক্ষরের বহু বিচিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতীক তৈরি এবং অক্ষরের বিভিন্ন ছাঁচ নির্মাণের কথা ভাবলে বর্তমান কালের অক্ষর সজ্জাকারী যন্ত্রের বিরাট কর্মভূমিকার কথা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মাত্র ২৬টি রোমান বর্ণমালা ও এর যতিচিহ্নসমূহের আকৃতি নির্মাণ করা এক কথা আর ৬০০টি বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন তলবিশিষ্ট একটি বর্ণমালার আকৃতি বা টাইপ তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ও আরবি অক্ষরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অক্ষরের রেখা ও বাঁকের যে বিপুল বৈচিত্র্য (যেমন বাংলা,তামিল ভাষা) তাতে হাতে অক্ষর-সজ্জা পরিহার করে ভারতীয় পত্র পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব করে তোলা বিশ্বে কম অভাবনীয় ব্যাপার নয়।

ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের উন্নয়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ভারত সর্বপ্রথম ছাপাখানা আধুনিকীকরণের সুযোগ লাভ করে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলো পরস্পরের মধ্যে পণ্য বিনিময়ে আগ্রহীথাকায় ভারত ছাপাখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে উঠার বিশেষ সুযোগ লাভ করে। ভারতে বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

লাইনোটাইপ ও মনোটাইপ যন্ত্র থাকায় ফলে অক্ষর সজ্জার সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। রোটারী প্রেসের মতো অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল মুদ্রণ যন্ত্র ভারতে শত শত না হলেও অনেক রয়েছে। মুদ্রণ ফলক তৈরি সরঞ্জাম, শিরোনাম দেয়ার জন্য লুডলোস (Ludlows) এবং এলয়ভস যন্ত্র, রুল ও বর্ডার ভারতের অন্যান্য অক্ষর সজ্জাকারী যন্ত্রের দক্ষতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মুদ্রণ শিল্পের অন্যান্য সাধারণ যন্ত্রাদি যেমন, ভাঁজ করার যন্ত্র, বাঁধাই ও সেলাই যন্ত্র, কর্তন যন্ত্র, প্রুফ প্রেস, ক্যামেরা এবং ব্লক নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ সাজ-সরঞ্জাম ভারতের মুদ্রণ শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

আজকাল উন্নত ধরনের পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্যে উল্লেখিত সাজ-সরঞ্জাম একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অবশ্য মুদ্রণ শিল্পে আরও উন্নততর পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সেখানে মুদ্রণ শিল্পে ইলেকট্রনিক্সের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, অক্ষরের আলোকচিত্র সজ্জা হচ্ছে। এ ছাড়া টেলিযোগাযোগ ও বহনযোগ্য বেতারযন্ত্র এবং প্লাষ্টিকের ব্যবহার মুদ্রণ শিল্পকে আরও উন্নত করে চলেছে।

পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ

মুদ্রণ পরিকল্পকের হাতে 'লিপি' পৌঁছে যাওয়ার পর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অবশিষ্ট দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। তাঁর কাজ হচ্ছে লিপিকে শিরোনামে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে বা প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠকের মনোযোগ মূল পাঠে নিবদ্ধ করা। (অবশ্য, সাময়িকীর বিশেষ রচনাটির পাণ্ডিত্যমূলক প্রকাশ দেখে সম্ভাব্য পাঠক যদি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন কিংবা এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ না জন্মায় তা হলে সেক্ষেত্রে চাতুরীপূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার না করলে পাঠক হয়তো মোটেই ঐ নিবন্ধ পড়ে দেখবেন না।

প্রত্যেক পত্র-পত্রিকা সে যে মেয়াদেই প্রকাশিত হোক না কেন– এর প্রতিটি পাতা এমনভাবে অক্ষর সজ্জা ও মুদ্রণ বিন্যাসের মাধ্যমে সাজানো হয় যাতে তা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পত্র-পত্রিকার ছাপা কেমন হবে তা পাঠকের রুচির উপর নির্ভরশীল। আবার পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা সজ্জার উপরও নির্ভরশীল হতে পারে। মুদ্রিত পৃষ্ঠায় অনেক কিছুই থাকে। এতে শিরোনাম, স্তম্ভ, বিজ্ঞাপন, রুল, বর্ডার, মোটা অক্ষর (hold type), হালকা (lightface) অক্ষর, ইটালিক অক্ষর, হাতে লেখার আদর্শে মুদ্রাক্ষর, ছবি, হাতে আঁকা অক্ষর, পাদটীকা, পরিচিতি ও অন্যান্য অলঙ্কারমূলক অঙ্গসজ্জা ও উপকরণ

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে। তবে এর সবগুলোই একই সঙ্গে সাধারণত এক পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশিত থাকে না; মূলত পৃষ্ঠার ছাপা ও যে কাগজে ছাপা হচ্ছে- এর মধ্যে একটা সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একক প্রকাশ যথার্থই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যদি এই সামঞ্জস্যময় একক প্রকাশে কোনো খুঁত থাকে, তবে ধরে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কেউ না কেউ এ জন্যে দায়ী।

যে কোনো একটি বিশেষ পত্রিকার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের ধারা দেখেই ঐ পত্রিকার নাম বলে দেওয়া যায়। পত্রিকার প্রদর্শন ভঙ্গী তার নামের পরিচিতি জানাতে পারে।

প্রদর্শনের ধরন বা কৌশল অনেকটাই বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। দৈনিক সংবাদপত্র শুধু রোজকার পড়া এবং ঐ দিনটার জন্য সংরক্ষণের উপযোগী করে লেখা ও ছাপা হয় (অবশ্য তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটলে বা ব্যক্তিগত দরকার থাকলে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে)। তাই প্রধানত নিবন্ধ ও সমালোচনায় পূর্ণ মাসিক পত্রিকা থেকে দৈনিক পত্রিকার প্রদর্শনের ধরন অবশ্যই আলাদা হতে হবে।

ইলেকট্রোনিক্স গণমাধ্যম

বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সংবাদ মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন তিনটিই প্রচলিত রয়েছে। বেতার এবং টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থায় সাংবাদিকতা বা সংবাদ পরিবেশনকে সম্প্রচার সাংবাদিকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ধরে নিতে হয় বেতারের মাধ্যমেই সম্প্রচার সাংবাদিকতার শুরু এবং বিকাশ। সম্প্রচার মাধ্যমের দুই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বেতার ও টেলিভিশনে সংবাদের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কারণ বহুবিধ, গুরুত্ব সম্পন্ন হবার কারণ বা পরিপ্রেক্ষিত জানার জন্যই মূলত ইতিহাসে খোজখবর নেবার পালা। সম্প্রচার শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে যেমন খানিকটা বিতর্ক আছে তেমনি সাংবাদিকতা নিয়েও বিতর্ক কম যায় না। সব বিতর্কের পরও ১৯০৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানসে থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে সানফ্রান্সিসকোতে খবর পাঠানোর ঘটনাকে সম্প্রচার সাংবাদিকতার প্রথম সূচনারূপে বিবেচনা করা চলে। ড. চার্লস ডেভিড হেরল্ড (Dr. Charles David Herrold) এ সময়ে প্রথম একটি অ্যান্টেনাসহ বেতার প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে শহরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে খবর প্রচার করেন। ড.

Dhaka University Institutional Repository

হেরল্ডের এই পরীক্ষামূলক প্রচার এ সময়ে শহরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্যানজোসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গর্ডন গার্ব (Gordon Greb) লিখেছেন, হেরল্ডের এই ক্ষুদ্র সম্প্রচার ব্যবস্থা যা পরে KOW হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত পিটসবার্গের KDKA সংবাদ নামে সম্প্রচার কার্য পরিচালনা করে যায়। হেরল্ডের যুগে সম্প্রচার ব্যবস্থার প্রভূত উৎকর্ষ সাধন হলেও বেতার সাংবাদিকতা বা আধুনিক অর্থে সম্প্রচার সাংবাদিকতা তখনো কিন্তু শুরু হয়নি। কদাচিৎ বড় ধরনের অঘটন ঘটলে তখন মাঝে মধ্যে ঐ ঘটনার প্রতিবেদন প্রচার করার চেষ্টা দেখা গেছে।

ক্রমবিকাশ

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসের ডেট্রয়েট নিউজ স্টেশন-৮ এমকে (The Detroit News Station-8 MK) মিশিগান রাজ্যের নির্বাচন সম্পর্কে খবর প্রচার করে। একই বছর ২ নভেম্বর KDKA কেন্দ্র 'প্রেসিডেন্ট হার্ডিং বরন্ন' এর নির্বাচন সম্পর্কে খবরাখবর প্রচার করে। ১৯২১ সালের জুন মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে "ROSTA" নামের একটি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার কেন্দ্র "কথা সংবাদপত্র" (Oral Newspaper) নামে খবর সম্প্রচার শুরু করে। পরের বছরই সম্প্রচার সাংবাদিকতায় স্ফুরণ ঘটে জন রিডের একক প্রচেষ্টায়। ১৯২২ সাল থেকে রিড বিবিসি'র মাধ্যমে নিয়মিত সংবাদ প্রচার শুরু করেন। প্রধান প্রধান বার্তা সংস্থা রয়টার, এপি, ইউ.এন.আই থেকে পাওয়া খবরগুলো দিয়ে সে সব সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হতো। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সম্প্রচার কেন্দ্র বড় বড় ঘটনাগুলোর বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করতে থাকে। ১৯২৪ সালে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন কাভার করার জন্য ১২টি স্টেশনের সমন্বয়ে একটি সম্প্রচার ব্যবস্থার কথা জানা যায়। এছাড়া ১৯২৫ সালে প্রেসিডেন্ট কুলিজ (President Coolidge) এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তৃতা কাভার করার জন্য ২১টি ষ্টেশন যোগ দেয়।

বেতার সম্প্রচারকারীরা সংবাদকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও ১৯২৬ সালের মে মাসের আগ পর্যন্ত শ্রোতারা বেতার সংবাদকে ঠিক ততোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। ১৯২৬ সালে বৃটেনে সাধারণ ধর্মঘটের কারণে সারাদেশ একটি নাড়া খায়। এ সময় বৃটেনে অচলাবস্থা দেখা দিল, কোনো সংবাদপত্র বের হলো না এবং উদ্বিগ্ন জনগণ তখন সংবাদপত্রের বিকল্প

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যম হিসেবে বেতারের দিকে ঝুঁকে পড়লো। এভাবেই বেতার সাংবাদিকতা আরো ব্যাপক অর্থে সম্প্রচার সাংবাদিকতা যুগের সূচনা করা হলো। রিভ এ সুযোগ নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিবিসি সে সময় পাঁচটি বুলেটিন প্রচার করতো এবং একঘণ্টা পরপর এসব চলতো। বাস, ট্রেনসহ অন্যান্য যানবাহনের সময়সূচি এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত সকল তথ্য বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

১৯৩০ সালের প্রথমভাগে সংবাদ সার্ভিস বিবিসিকে তার বুলেটিনের সময়সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশ-বিদেশ থেকে বিবিসির কর্মচারীদের বিবরণী বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে কাজের অধিকতর স্বাধীনতা দেয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু জনরিভের সঙ্গে রিচার্ড ডিম্বলবি সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের পুরনো পদ্ধতিকে বদলিয়ে সরাসরি গভীরভাবে বিশ্লেষণসহ প্রচারে আত্মনিবেশ করেন। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবাদ আর সংবাদের সঙ্গে জড়িত খবর শ্রোতামণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দিতে চান। "কেলাস" প্রাসাদের অগ্নিকান্ডের মতো বিরাট ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলো প্রচার সাংবাদিকতা কি অসাধ্য সাধন করতে পারে। সান্ধ্যকালীন সংবাদপত্রগুলোর শেষ সংস্করণ চূড়ান্তভাবে ছাপিয়ে বের হবার পর পরই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। সুতরাং রাতের বাকি প্রহরগুলো ছিলো বিবিসি'র দখলে। 'কেলাস' প্রাসাদের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রচারের পুরো কৃতিত্বই ছিল বিবিসি'র। রিচার্ড ডিম্বলবি তার সঙ্গী প্রতিবেদক ডেভিড হাওয়ার্থকে নিয়ে মটরযোগে দ্রুত সানডেমহামে চলে যান। পেছনে আসলো রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি নিয়ে গাড়ি। জনতার ভীড় ঠেলে তাঁরা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করলেন দ্রুত। তারপর একটি রেস্তোরার টেলিফোন লাইন কেটে বার্তা কক্ষে সংবাদ দিচ্ছেন, সেই সংবাদ শ্রোতার কানে পৌঁছতে থাকলো। ১৯৩৮ সালের মধ্যে বৃটেনের ঘরে ঘরে বেতার সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করানো হলো। অথচ সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের পদ্ধতিতে কোনো রকম রদবদল করা হয়নি। ১৯৩৮ সালে শুরু হলো যুদ্ধ আর তখনই দেখা দিলো কোথায় কি ঘটনা ঘটছে তার প্রকৃত সংবাদ জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা। খবর শোনার সবচাইতে ব্যস্ত সময়গুলো সংবাদগুলো বুলেটিনের দখলে আসতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি। সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে সাংবাদিকতা নতুন ব্যঞ্জনা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন মুল্লুকে

ইউরোপের সম্প্রচার সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা হলো। মার্কিন মুল্লুকে ১৯২৬ সালের নভেম্বরে ২৫ জন সদস্য নিয়ে ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (Natinal Broadcasting Company) বা NBC গঠিত হবার আগ পর্যন্ত সম্প্রচার সাংবাদিকতার নেটওয়ার্ক স্থায়ী হয়নি। NBC'র নেতৃত্বে সম্প্রচার কেন্দ্রগুলো তাদের সম্প্রচারকের একটি স্থায়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করছিলো। ১৯২৭ সালের মধ্যে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কোম্পানি ১৬টি স্টেশনের সমন্বয়ে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠন করে। বেতার সংবাদ সম্প্রচার এ সময় ক্রমশ পুরো আমেরিকা জুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বেতার সংবাদের জনপ্রিয়তার কারণে সংবাদপত্রগুলো তাদের বিজ্ঞাপন হারাতে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা মনে করলেন বেতারের জনপ্রিয়তাকে তারা পণ্য বিপণনের কাজে লাগাতে পারেন। সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পৌছার জন্য সংবাদপত্রের বিকল্প হিসেবে বেতার হয়ে উঠে এক শক্তিশালী মাধ্যম।

সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য করা এবং বেতারের মাধ্যমে খবর প্রচার না করতে দেয়ার জন্য মার্কিন সংবাদপত্র মালিকগণ 'ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' তৎকালে ইউনাইটেড প্রেস (United Press), অ্যাসোসিয়েট প্রেস (Associate Press) এবং ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস (International News Service) কে বেতারে সংবাদ বিক্রয় বন্ধ করার আহবান জানান এবং এক পর্যায়ে বেতার সম্প্রচারের জন্য এসব সংবাদ সংস্থা সংবাদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বেতার কেন্দ্রগুলো এ সময় সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব সংবাদদাতা নিয়োগ করে সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে। ১৯২৭ সালে লিন্ডেনবার্গের ওয়াশিংটন আসার ঘটনাটিকে প্রতিযেদন হিসেবে প্রচার করা হয়। একই সময়ে বেতার সম্প্রচারের জন্য নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহ ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগৃহীত সংবাদ প্রেরণের জন্য ট্রান্স রেডিও নিউজ সার্ভিস (Trans Radio News Service) এবং প্রেস রেডিও নিউজ সার্ভিস (Press Radio News Service) প্রতিষ্ঠিত হলো। তারা সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোকে সংবাদ পৌছাতো। মার্কিন মুল্লুকে বেতার সাংবাদিকতা এভাবে নিশ্চিত বিরোধিতা জনিত সংকট থেকে মুক্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়; বেতার সংবাদ সংক্ষিপ্ত এই অজুহাতে বেতার সংবাদ বয়কট করার জন্য ডাক দেয় মার্কিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইউনিয়ন। কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশক সমিতি ১৯৩৩ সালে একই মালিকানাধীন

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও বেতার স্টেশনগুলোতে সীমিতাকারে সংবাদ সরবরাহ করার কথা ঘোষণা দেয়। ১৯৩৫ সালে বার্তা সংস্থা AP এবং UNI ও INS বেতার কেন্দ্রগুলোতে সংবাদ বিক্রয় করতে থাকে। AP এবং UPI সম্প্রচার উপযোগী করে সংবাদ বিবরণী পাঠাতে থাকে। এ সময় শ্রোতাদের খবর শুনতে অভ্যস্ত করার জন্য বেতার কেন্দ্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংবাদ সম্প্রচারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর CBS প্রতিবেদক (Giants–Dodgers) মার্কিনিদের জয়ান্টস ও ডজারস (Gaints–Dodgers) এর মধ্যকার ফুটবল খেলার বিবরণ দিচ্ছিলো এ সময় পার্ল হার্বারের বিপর্যয় ঘটলো। জাপানি বিমানের এই আক্রমণ সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে সাংবাদিকতা দ্রততর ব্যবস্থা হিসেবে জনমনে স্থান করে নেয়। পার্ল হার্বারের হামলা সম্প্রচার সাংবাদিকতায় একটি মাইলফলক। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বোমা হামলার ঘটনা ৬৫ শতাংশ মার্কিনিদের বেতার সংবাদ শুনতে আগ্রহী করে তোলে এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার যে বক্তৃতা দেন শতকরা ৮০ জন শ্রোতা এই বক্তব্য শুনেছেন।

সোভিয়েত অভিজ্ঞতা

সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্প্রচার সাংবাদিকতা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও লেনিন প্রচার মাধ্যমকে জাতীয় সংহতির কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন। শুরু থেকেই বিভিন্ন খবরাদি প্রচার করতো ROSTA প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টায় এসব খবর প্রচার করা হতো। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরের ৭ তারিখ মস্কো বেড স্কোয়ার থেকে সরাসরি অক্টোবর বিপ্লবের খবর প্রচারিত হয়েছিলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্প্রচার সাংবাদিকতার বিকাশ এবং প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করে। তত দিনে সম্প্রচার মাধ্যমের অন্য শক্তিধর, শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন এসে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা সম্প্রচার সাংবাদিকতায় জনপ্রিয়তাকে তুঙ্গে নিয়ে পৌছায়। যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য মানুষ সর্বদা উদগ্রীব থাকে। বেতার কেন্দ্রগুলো এ সুযোগে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সবিস্তারে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা চালায়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রচারে সংবাদের ৩০ ভাগ সময় যুদ্ধের খবরাখবর দেয়া হতো। এ সময় বিবিসির টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪২ সালে বিবিসি একটি বিশেষ সংবাদ বিভাগ গড়ে তোলে এবং বিরাট সংবাদদাতা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। খবরের পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে ঘটনাকে সাজিয়ে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে সর্বোত্তম মান অর্জন করার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারে বিবিসি নতুনত্বের জন্ম দেয়। নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখায়ও বিবিসি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পুরো সোভিয়েত বেতার জার্মানির বিরুদ্ধচরণ করে সম্প্রচার অব্যাহত রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্প্রচার সাংবাদিকতায় সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি এবং তা প্রচারের বিভিন্ন কৌশল শিখতে সহায়তা করে। অকুস্থল থেকে প্রতিবেদন তৈরি, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত সম্বলিত প্রাণবন্ত করে সম্প্রচার সাংবাদিকতায় কলাকৌশলে জনগণকে ক্রমে আরো আগ্রহী এবং এক পর্যায়ে নির্ভরশীল করে তোলে। বেতারে যুদ্ধের খবর পরিবেশনের মাত্রা ও রকম যেন বাড়তে থাকে। সম্প্রচার সাংবাদিকতার আসল স্বাদ যুদ্ধকালেই পাওয়া গেছে। সাংবাদিক Howard K. Smith, Robert Trout, Eric Sevareid, George Herman এবং Edward R, Murrow এ সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। E.R. Murrow–এর This is London Calling সম্প্রচার সাংবাদিকতায় আজো বিস্ময় হয়ে আছে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষে বেতার সম্প্রচারিত সংবাদের প্রতি মানুষের আগ্রহ আবার কমে যেতে থাকে। বেতার কেন্দ্রগুলোতে ঘন ঘন সংবাদ প্রচারও কমিয়ে দেয়- ছোট ছোট কেন্দ্রগুলো সংবাদ প্রচার এক অর্থে বন্ধ করে দেয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েকবছর ছিল সম্প্রচার সাংবাদিকতার মন্দাকাল। অবশ্য এই মন্দাকাল খুব বেশি দিন থাকেনি। বন্ধ করে দেয়া বিবিসি টেলিভিশন আবার চালু করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪২ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের যোগাযোগ বোর্ড বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো তাও এ সময় তুলে নেয়া হলো। ১৯৫০ থেকে টেলিভিশন সম্প্রচার সাংবাদিকতায় নতুন যুগের প্রবর্তন করলো।

পঞ্চাশের দশকে টেলিভিশন সম্প্রচার বিকাশের শুরুতে টিভি সেটের অপ্রতুলতা, চড়া দাম, বৈদ্যুতিক সুবিধার অভাব ইত্যাদি কারণে সাধারণের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারছিল না। বেতার এ সময় অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। টেলিভিশন কেন্দ্রগুলো ভুল করেনি, বেতার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনুষ্ঠানের বদলে সংবাদকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। বেতারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না নেমে স্বয়ং বেতারের আদলে পরীক্ষামূলক সংবাদ সম্প্রচার করে। এ সময় বেতার বেঁচে থাকার দায়ে নিজেকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং ক্ষিপ্রতা ও সহজ হবার সুযোগে টিকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

টেলিভিশনে এখন বৈদ্যুতিক সংবাদ সংগ্রহ বা ই,এন,জি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। বেতারে মোবাইল ফোন, টেলিভিশনে উপগ্রহ এর অন্তর্ভূক্তি সত্যিকার অর্থে সম্প্রচার সাংবাদিকতাকে উত্তরোত্তর সুউচ্চ শিখরে নিয়ে আসছে। বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ সম্প্রচারের তাৎক্ষণিকতা সংবাদের সংজ্ঞায় এনেছে বিপ্লব আজ সংগঠিত হয়েছে এসব ঘটনার বিবরণ নয়; সংঘটিত হচ্ছে এমন ঘটনার বিবরণই হচ্ছে সংবাদ। বেতার-টেলিভিশন এখন সরাসরি বা লাইভ প্রচার করছে। সাংবাদিকতায় পুরনো মাধ্যমের সঙ্গে সমান তালে টিকে আছে। বিবিসি, সি.এন.এন, ভি.ও.এ,অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন, এন.এইচ,কে আজ ২৪ ঘণ্টা খবর প্রচার ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে। এই বিশ্বগ্রামে রূপান্তরের একক কৃতিত্ব সম্প্রচার সাংবাদিকতার।

বেতার ও টেলিভিশন তথা সম্প্রচার সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ অন্ত হীন; দায়িত্বহীনতা, মন্দভাষা, কূটনৈতিক সম্পর্কহানী, পক্ষপাত, বিক্রেতাদের কোলাহলকে উৎসাহ দান ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি সম্প্রচার সাংবাদিকতায় বিশ্বস্ত নই? নইলে পিটার আর্নেট অথবা পিটার সিজনস, জাকি সামনস্কি, আতাউস সামাদ, ক্রিস্টিয়ানা আমানপুরের প্রতিবেদনে বিশ্বাস রাখি কি করে। বিশ্বাস সম্প্রচার সাংবাদিকতাকে করেছে মহান। কারণ সরাসরি শুনছি ও দেখছি জীবন্ত মানুষকে.... কারো বর্ণনায় নয়।

বেতার পরিচিতি ঃ সম্প্রচার সাংবাদিকতার সূচক

বেতার বা রেডিও অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী এক গণমাধ্যম। বিশ্বে বেতারের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য এখনো বিরাজমান। কারণ বেতারের মাধ্যমে সবচেয়ে কম সময়ে লক্ষ কোটি মানুষের কাছে খবর পৌছে দেয়া সম্ভব। উন্নয়ন অভিমুখী দেশে নিরক্ষরতা, মুদ্রণ মাধ্যম তথা সংবাদপত্র বিকাশের পথে বড় বাধা-অথচ বেতারের জন্য নিরক্ষরতা কোনো বাধাই নয়। গণমাধ্যম হিসেবে বেতারের ভূমিকা ব্যাপক হলেও এর আবির্ভাব খুব বেশিদিন আগে নয়। আমেরিকার পিটসবার্গে ১৯২০ সালের ২ নভেম্বর বেতার সম্প্রচার প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এরপর ১৯২২ সালের নভেম্বরে বৃটেনে বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯২২ সালের অক্টোবরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ১৯২৩ সালের নভেম্বরে রেডিও ক্লাব অব বেঙ্গলের সহায়তায় ভারতবর্ষে প্রথম বেতার অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে বেতার সম্প্রসারণের আর

Dhaka University Institutional Repository

কোনো অবকাশ নেই। সারা বিশ্বে আজ একশ কোটিরও বেশি রেডিও সেট রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে বিশ্বের প্রতি চারজনের একজন একটি বেতার সেটের মালিক। বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামেও কমপক্ষে একটি করে বেতার গ্রাহক যন্ত্র রয়েছে।

বেতার যন্ত্র ও সম্প্রচার

উনিশ শতকের শেষভাগে সত্তর দশকে 'আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল' টেলিফোন' আবিষ্কার করলেন যার মধ্যদিয়ে সর্বপ্রথম তারের মাধ্যমে গণমানুষের কণ্ঠস্বর দূরে পাঠানো সম্ভব হলো। টেলিফোন ব্যবস্থায় অসুবিধা হলো একজনের কণ্ঠস্বর একজন ছাড়া অন্যরা একযোগে শুনতে পায় না। আন্তঃব্যক্তিক বা দুইজনের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব, গণযোগাযোগে টেলিফোন অক্ষম। তদুপরি টেলিফোন ব্যবস্থায় তার সংযোগ ছাড়া খবর নেয়া অথবা দেয়া কোনোটাই সম্ভব হয় না। তার ব্যবস্থায় এসব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্যই বলতে গেলে বেতার ব্যবস্থার আবিষ্কার। মূলত বার্তা বা খবর আদান-প্রদানের জন্য বেতার আবিষ্কার হয়েছিল। সে সময় অবশ্য গণযোগাযোগের কথা চিন্তা করা হয়নি—অথচ বেতার ব্যবস্থার আবিষ্কারের সাথে সাথে গণযোগাযোগের অসামান্য দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

বেতার বা রেডিও শব্দটি ইংরেজি 'Radiation' বা বিচ্ছুরণ শব্দ থেকে এসেছে। মূলতঃ বাতাসের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গকে মহাকাশে বা বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত করার পদ্ধতি হতে বেতারের উদ্ভব। শান্ত ও নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ফেলা মাত্রই শুরু হবে আলোড়ন। পুকুরে প্রথমে ছোট্ট একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি হবে, তারপর বাড়তে বাড়তে এই ঢেউ সারা পুকুর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পুকুরে এ সময় একটি কাগজের নৌকা অথবা ছোট্ট এক টুকরা হালকা কাঠ যদি ভাসিয়ে দেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ঢেউয়ের দোলায় কাঠটি অথবা নৌকাটি উঠানামা করছে। বেতার সম্প্রচার এই নীতির অনুসরণ মাত্র। মনে করা যাক ঢিলটি হচ্ছে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র। কাগজের নৌকা বা হালকা কাঠের টুকরাটি গ্রাহকযন্ত্র যাকে ইংরেজীতে 'Receive' বলা চলে। আর সৃষ্ট ঢেউগুলোকে ধ্বনি তরঙ্গ বলা যায়। সম্প্রচার কেন্দ্র হতে শব্দ ছুঁড়ে বাতাসে লক্ষ লক্ষ ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। আর গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই ধ্বনি তরঙ্গকে ধরে রাখা হয়। বেতার সম্প্রচার এভাবেই কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনিতরঙ্গ বিদ্যুৎ শক্তিরই উপজাত। কিন্তু মহাকাশের মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয় ধ্বনিতরঙ্গ কিন্তু তার অংশ নয়। মহাকাশের ধ্বনিতরঙ্গ রঞ্জন অথবা অতি বেগুনি রশ্মির মত উত্তপ্ত তরঙ্গের অংশ। অলটারনেট কারেন্টের তুলনায় বেতার তরঙ্গের স্পন্দন অনেক বেশি দ্রুত---- প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ বা তারও বেশি। বেতার তরঙ্গ এবং আলোক তরঙ্গের সেকেন্ড প্রতি গতিবেগ ৩০ কোটি মিটার বা ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল আলোক, তাপ এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে বেতার তরঙ্গ দীর্ঘতর।

বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ট্রান্সমিশন যন্ত্রে উচ্চহারে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়। মাইক্রোফোনে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে তার শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ স্পন্দনে রূপান্তরিত করা হয়। এই বিদ্যুৎ স্পন্দনকে ইলেক্ট্রন টিউবের সাহায্যে বিবর্ধন বা Amplification করা হয়। বিবর্ধিত স্পন্দনকে প্রেরকযন্ত্রের বিদ্যুৎ স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে প্রেরকযন্ত্রের সংলগ্ন আকাশ তারে মিশ্র তরঙ্গের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ট্রান্সমিশন লাইনের অবিমিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে।

আকাশে ভাসমান বেতার তরঙ্গকে ফ্রিকোয়েন্সির সাহায্যে আলাদা করা হয়। অলটারনেট কারেন্ট এর ফ্রিকোয়েন্সি হলো ৫০ সাইকেল। অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি একটি দিকে আন্দোলিত হয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়, আবার আন্দোলিত হয়। সেকেণ্ডে ৫০ বার আন্দোলিত-নিমীলিত হবার ঘটনাকে বলা হচ্ছে সাইকেল। বেতার তরঙ্গের এই আন্দোলিত নিমিলিত হবার গতি সেকেণ্ডে ৫০ সাইকেল শুধু তাই নয় বেতারের এই গতি সেকেন্ডে ৫০ লাখ বারও হতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন বেতার তরঙ্গের নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথ প্রয়োজন। এক একটি শব্দ তরঙ্গের পথ অতিক্রম দূরত্বকে 'ওয়েভলেংথ' বলা হয়। একটি তরঙ্গ তার নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করার পরই কেবল আর একটি তরঙ্গ তার অনুগমন করে। শব্দ তরঙ্গের গতিকে শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথ এর সঙ্গে যুক্ত ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া সম্ভব। অবশ্য আজকাল সম্প্রচারের সময় নির্দিষ্ট বেতার নিজস্ব অনুষ্ঠানসূচী কতো ফ্রিকোয়েন্সি এবং ওয়েভলেংথ এ অনুষ্ঠান বা খবরাদি প্রচার করছে তা জানিয়ে দেয়। বেতার যন্ত্রে সেই নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথ থেকে অনুষ্ঠানসূচী ধরা সম্ভব।

বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থায় ২শ থেকে ৬শ মিটার ওয়েভলেংথকে 'মিডিয়া ওয়েভ' বলে। তরঙ্গগুলির শক্তি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর কয়েকশত মাইল যাবার কালে ক্ষীণতর হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৩ থেকে ৯০ মিটার ওয়েভলেংথ

Dhaka University Institutional Repository

এর শক্তি আরো কম; এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে 'শর্টওয়েভ'। এক হাজার থেকে ২ হাজার মিটার ওয়েভলেংথকে বলা হয় 'লংওয়েভ'। বেতার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত তরঙ্গ আয়নমন্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসে। ভূ-পৃষ্ঠে এই ফিরে আসা তরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্র ধরে নেয়। আয়নমন্ডল হলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ১শ থেকে ২শ ৫০ কিলোমিটার দূরের তড়িৎ পরিবাহী কয়েকটি বায়ুস্তর।

বেতারের উদ্ভাবন

বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করা এবং বেতার তরঙ্গের প্রকৃতি অনুধাবন করার সূত্র ধরেই বিনা তারে বৈদ্যুতিক ধ্বনি তরঙ্গের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা এবং বেতারের উদ্ভব। বেতার আবিষ্কারের একক কোনো দাবিদার নেই। অনেকের মনে একই সময়ে বেতার সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠেছিল। 'মাইকেল ফ্যারাডে' এদের একজন। ১৮৩১ সালে তিনি প্রথম 'ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশান তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন। ফ্যারাডের তত্ত্ব অনুসারে একটি সার্কিটের তরঙ্গ অন্য সার্কিটে সঞ্চালিত হয় এবং সার্কিটটিকে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব। বিজ্ঞানী 'ম্যাক্সওয়েল' ১৮৬৩ সালে আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎ ও চুম্বকতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে আলোক তরঙ্গ আসলে বিদ্যুৎ ও চুম্বকেরই তরঙ্গ। তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন ম্যাক্সওয়েল। ১৮৮৭ সালে 'হাইনরিখ হারজ' বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখান। ১৮৯১ সালে 'ক্লার্ক ম্যাক্সুয়েল' বেতার টেলিগ্রাফি ব্যবস্থা প্রচলন সফল হলেন। আর ১৮৯৬ সালে, ভিন্নমতে ১৮৯৫ সালে 'মার্কিনি' হাতে কলমে বেতার বার্তা প্রেরণ করে দেখান। তার ব্যবহারিক প্রদর্শন বেতার টেলিগ্রাফির উপযোগিতা প্রমাণ করে।

বেতার টেলিগ্রাফ থেকে সরাসরি বেতার এ পৌঁছতে, অর্থাৎ বিনা তারে সঙ্কেত শুধু নয়, শব্দ প্রেরণে সাফল্য লাভ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে। প্রয়োজন হয়েছে ইলেকট্রিক তথা ইলেক্ট্রনিক্স শাস্ত্রের অগ্রগতি ও বিশেষ কিছু যন্ত্রাংশের উদ্ভাবন----- যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্লেমিং এর হাত ঘুরে ১৯০৪ সালে দুই ডায়ো বিশিষ্ট থার্মোআয়োনিক ভালভের উদ্ভাবন। এই যন্ত্রাংশ মাইক্রোফোনে শব্দ থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গের ক্ষীণ হ্রাস-বৃদ্ধিকে প্রবর্ধিত করার ও বেতার তরঙ্গ যোগে সম্প্রচারের সুযোগ দিয়েছিলো অ্যামপ্লিফায়ার মডিউলেটর এবং অসিলেটর এর মধ্যস্থতায়।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার সেটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। জাপানি কোম্পানিগুলোর অব্যাহত উদ্ভাবন ভারী বেতার সেটের বদলে আজকাল সহজে বহনযোগ্য বেতার সেট সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে গেছে বেতার সেট। ইলেক্ট্রনিক উদ্ভাবনে নিত্যনতুন অগ্রগতি এবং মহাকাশ উপগ্রহের উন্নতির ফলে আরো ক্ষুদ্র বেতার সেট তৈরি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এখন হাতঘড়ির সঙ্গে বেতার তৈরির খবর শোনা যাচ্ছে। মটর গাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত বেতার মোটর আরোহীদের নিত্যসঙ্গী হয়েছে। ঘড়ির সাথে যুক্ত হলে চলমান পদাতিক মানুষের নিত্যসঙ্গী হবে বেতার। মোটকথা, গণযোগাযোগ ব্যবস্থার পুরনো 'বেতার' ব্যবস্থা মানুষের কাছে আজ বিনোদন আর খবরের শক্তিমান যোগানদার হয়ে উঠেছে। উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশের লক্ষ কোটি শ্রোতা আজো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘোষণা শুনতে বেতারকেই সঙ্গী করে থাকে। একুশ শতকেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

টেলিভিশন ঃ আলোকিত সম্প্রচার জগৎ

টেলিভিশন শতাব্দীর তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয়, শক্তিশালী ও বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, শৈল্পিক প্রকরণ, প্রচারের ব্যাপ্তি, তাৎক্ষণিক কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব—সবকিছুতেই টেলিভিশন হয়ে আছে শতকের মর্যাদাবান মানব সংযোগ মাধ্যম। বলা চলে শতাব্দীর বিস্ময় টেলিভিশন। বর্তমান মানব সমাজে কিংবা জীবনে টেলিভিশন যন্ত্রটির প্রভাব বলতে গেলে ঈর্ষার। টেলিভিশনের অনস্বীকার্য প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা এখন অমূলক। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে একটি পরিবারের সবাই সহজে মোহমুগ্ধ হন, শুধু কি তাই? টেলিভিশন পরিবারের বাইরে জনপদ ও বিশাল জনগোষ্ঠীকে উদ্বেলিত, কখনো শঙ্কাগ্রস্ত আবার কখনো শঙ্কামুক্ত ভাবনাহীন করে। টেলিভিশন ভাবনার মনোজগতে হানা দেয়, দিবা স্বপ্নের জন্ম দেয়, আবার বাঁচার আশাও জাগায়।

টেলিভিশন সম্প্রচারে ট্রান্সমিশনের সুবিধা এবং মাইক্রোওয়েভ ও উপগ্রহ সংযুক্তির বিস্তীর্ণ ব্যবস্থাপনা আর ভিডিও ক্যাসেটের মধ্যে সব রকমের ছবি মজুত করে রাখার সুযোগ-সুবিধা হাতে আসার কারণে 'টেলিভিশন' এখন মানুষের নবার্জিত জ্ঞানের প্রচার, খুটিনাটি তথ্য পাঠানো এবং বহুবিচিত্র অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে যে একক আধিপত্য—আয়োজন; ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। বস্তুত আমাদের সময়ের তথা বর্তমান সংক্ষুব্ধ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন যা দৃশ্য, শ্রুতি ও গতির বিশ্বাসযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঞ্জনা আর শৈলীর সমন্বয়ে জীবনকে করেছে প্রতিনিয়ত গভীরতর, পল্লবিত ও ব্যাপৃত। উন্নত বিশ্বে আজ টেলিভিশন মানুষের এমন এক নিত্যসঙ্গী ও সমাজ প্রভু যা কোনো একটি পরিবার, একটি দর্শন অথবা একটি ধর্মীয় মতবাদের একজন শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ।

টেলিভিশনের রশ্মির কিছুটা বিকিরণ মানুষের শরীর ও চোখের জন্য ক্ষতিকর হলেও কে শোনে সে সাবধানবানী। বিশ্বের উন্নত অনুন্নত সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা দৈনিক কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ ঘন্টা নিয়মিত টেলিভিশন দেখছে। এক কথায় আজ টেলিভিশন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিকভাবে সম্পৃক্ত, সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুসরিত, ব্যাপকভাবে অনুকৃত এবং একই সঙ্গে তীক্ষ্মভাবে সমালোচিত; বিতর্কিতও অবশ্য। মোটকথা আধুনিক জীবনে টেলিভিশন ছাড়া মানুষের জীবন অপরিপূর্ণ। টেলিভিশনকে যেন তেন প্রকারে কিঞ্চিত ধর্তব্যের মধ্যে রাখা কিংবা উপেক্ষার অঙ্গুলী প্রদর্শন চলবে না; কারণ টেলিভিশনকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে নিজস্ব দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া আর নিন্দা করার অর্থ হলো দায়িত্বকে পরিহার করা।

টেলিভিশন ঃ পরিচয়

টেলিভিশন শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক টেলি (Tele) এবং ইংরেজি ভিশন (Vision) শব্দ দুটি মিলিয়ে। বাস্তবে টেলিভিশন গতিচিত্র ও বেতারের সম্মিলিত রূপ। প্রকৌশলগত দিক থেকে টেলিভিশন হলো চলমান চিত্রের তড়িৎ সম্প্রচার এবং একই সঙ্গে সংবাহী শব্দের বৈদ্যুতিক সম্প্রচার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে দর্শন ও শ্রুতির অনুভূতিকে তাদের স্বাভাবিক পরিধির বাইরে বিস্তৃত করা। আর টেলিভিশন পদ্ধতির বিবেচ্য হলো স্বাভাবিক দেখার দিকগুলো অর্থাৎ দৃশ্যে উপস্থিত বস্তু ঔজ্জল্য, বর্ণ, আকার আকৃতি, বিশদতা এবং অবস্থান সম্পর্কে তারতম্য নির্ণয়ে মানব চক্ষুর পারঙ্গমতা। একইভাবে স্বাভাবিক শ্রুতিকে নির্দিষ্ট করে কান তার স্বর বিন্যাস, স্বরোচ্চতা, স্বরগ্রাম এবং শব্দের অবিকল শ্রুতিকে নির্ণয় করার ক্ষমতা দিয়ে।

টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা এবং যন্ত্রটি ফোটোইলেক্ট্রিক সেল, স্ক্যানিং বা বিভক্তিকরণ রীতি এবং ক্যাথোড-রে টিউব-এই তিনটি যন্ত্র কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। টেলিভিশন সম্প্রচারে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান কোনো বস্তু এবং শ্রবণযোগ্য শব্দের এমন সমন্বয় করা হয় যেন গ্রাহক যন্ত্রে অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

টিভি সেটে তা অবিকল দেখা এবং শোনাও যায়। সম্প্রচার কেন্দ্র হতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে ছবিকে বিভক্ত বা স্ক্যান করার মধ্য দিয়ে ইমেজ পাঠানো হয়।

রঙিন টেলিভিশনে লাল, সবুজ ও নীল রঙের সমন্বিত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ এই তিনটি রঙ রঙিন টেলিভিশনের মৌলিক রঙ। রঙিন ফটো ফিল্মে তিনটি মৌলিক রঙের এক একটির প্রতি সংবেদনশীল এক একটি ফটো অবদ্রব স্তর থাকে। একটি সেল লাল রঙের ফিল্টারের আড়ালে, আর একটি হলুদ রঙের ফিল্টারের আড়ালে এবং তৃতীয়টি নীল রঙের ফিল্টারের আড়ালে বসানো থাকে। গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি রঙিন ফিল্টারের আড়ালে তিনটি আলোক উৎস রয়েছে। তিনটি আংশিক রঙিন ইমেজ নিখুঁতভাবে একত্রিত হলে বাস্তবের ইমেজটি পাওয়া যায়।

টেলিভিশনের কথা উঠলে ভিডিও ক্যাসেটের কথা চলে আসে। শব্দের জগতে ডিস্ক রেকর্ডের পর যেমন টেপ রেকর্ড, তেমনি চিত্র ও বাণীর জগতে এসেছে ডিস্কের বদলে ভিডিও টেপ। ম্যাগনেটিক টেপে ধারণ করে টিভি ইমেজ এখন বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত আছে। এছাড়া ক্যাবল টিভি, উপগ্রহ সম্প্রচার, পে, টিভি, ইন্টারঅ্যাকটিভ টেলিভিশনের প্রচলন হয়েছে।

টেলিভিশন উদ্ভাবন

টেলিভিশন কোনো আকস্মিক প্রেরণাজাত একক মস্তিষ্কের কর্মফল নয়। ধারাবাহিক এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কৌশলের বিবর্তন সর্বোপরি উন্নতির বহু ধারার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মিলন থেকে টেলিভিশনের উদ্ভব। টেলিভিশন আবিষ্কারের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৮৪ সালে। জার্মানী বিজ্ঞানী Paul G. Nipkow যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিত্র বিভক্তিকরণ বা Scanning এর সফল ব্যবস্থা করেন। নিপকোর স্ক্যানিং ব্যবস্থায় যে বস্তুকে স্ক্যান করতে হবে তা একটি ঘুরন্ত চাকতির সামনে রাখা হতো। তারপর বস্তুর ওপর আলো ফেলা হতো। একপাশ থেকে আর চাকতির অপর দিকে থাকতো ফটো সেল। ঘুরন্ত চাকতির ফুটো পেরিয়ে দফায় দফায় বস্তুর টুকরো টুকরো অংশের আলো আঁধারের তীব্রতা অনুসারে ফটো সেল উজ্জীবিত বা তিমিত হয়ে বিভিন্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করতো। সংকেতবাহী এই প্রবাহ পৌঁছতো গ্রাহক যন্ত্রে। সেখানেও জ্বলতো একটি বৈদ্যুতিক আলো, আর প্রেরক যন্ত্রের মধ্যে সমলয়ে ঘুরতো অনুরূপ একটি দ্বিতীয় স্ক্যানিং চাকতি। বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্রম

Dhaka University Institutional Repository

বেশি অনুসারে গ্রাহকযন্ত্রের আলো বাড়াতো বা কমাতো ও দ্বিতীয় স্ক্যানিং ডিস্কের সামনে উপবিষ্ট দর্শকের চোখের মূল বস্তু এবং প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতো।

ম্যাকানিক্যাল স্ক্যানিং পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই ১৯২৬ সালে জন লগি বেয়ার্ড (J.L. Baird) প্রথম সাধারণ মানুষকে টেলিভিশন দেখার সুযোগ করে দেন। পরে বিবিসি যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করলে টিভি সম্প্রচার জগতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা সূচিত হয়। ১৯২২ সালে ফিলো টি. ফ্যান্সোয়াথ নামের এক আমেরিকান বিজ্ঞানী টিভির প্রাণ এই ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির উদ্ভাবক। বিজ্ঞানীরা ক্যাথোড রশ্মির পরিচয় অবশ্য মধ্য উনবিংশ শতকেই পেয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ ব্রাউন (F. K, Braun) আবিষ্কার করলেন ক্যাথোড রে টিউব বা সি.আর.টি। আর রুশ বিজ্ঞানী বোরিস রোজিং (Boris Rosing) এবং তার ছাত্র ভ্লাদিমির কে.জাওয়ারিকিন (V.K. Zworykin) ১৯২৩ সালে স্ক্যানিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের ব্যবহার যোগে টেলিভিশন ক্যামেরা টিউব আবিষ্কার করেন যে টিউবের স্ক্রিনকে এমন একটি পর্দার মতো ব্যবহার করা হয় যার ওপর টেলিভিশনের প্রতিবিম্ব এঁকে দেয় বা মূল দৃশ্যকে কপি করে অবিশ্বাস্য গতিতে টিউবের এক প্রান্ত থেকে ধাবমান ইলেক্ট্রন কণাদের নিক্ষেপ করে। ইলেক্ট্রন গান ডিফ্লেকশন সিস্টেম নামে পরিচিত এই টিউবের আর একটি যন্ত্রাংশের সাহায্যে ইলেক্ট্রন সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করেই সাঙ্গ হয় স্ক্যানিং এর কাজ। তাঁর আবিস্কৃত সেটে ব্যবহৃত টিউব (Kinescope) দিয়ে ১৯২৯ সালে প্রথম স্বার্থকভাবে টেলিভিশন সম্প্রচার পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়।

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক শোয়েনবার্গ (Sir Isaac Shoenberg) এর নেতৃত্বে একদল প্রতিশ্রুতিশীল পদার্থ বিজ্ঞানী ১৯৩৫ সালের মধ্যে নিরলস পরিশ্রম করে ক্যামেরা, ধারণ টিউব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারণ সার্কিটসহ জটিল ইলেকট্রন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন।

টেলিভিশন সম্প্রচারের যুগ মূলতঃ ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এ বছর ফ্রান্স এবং বৃটেন সম্প্রচার শুরু করে। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ১৯৩৬ সালে লন্ডনের আলেকজান্দ্রা প্রাসাদ থেকে সর্বপ্রথম জনসাধারণের জন্য সম্প্রচার ব্যবস্থা চালু করে। এরপর ১৯৩৯ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মস্কোর লেনিনগ্রাদ টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সোভিয়েতরা সম্প্রচার শুরু করে। ইউরোপীয় দেশগুলো দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বযুদ্ধের পর পর ১৯৫০ সালের মধ্যে নিয়মিত টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। জাপান ১৯৫৩ সালে, ভারত ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৬০ সালে জাপান সর্বপ্রথম তাদের রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে।

মুদ্রণ, বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা শৈলীতে শব্দ, শ্রুতি ও দৃশ্যের সম্প্রচার নতুন অথচ শক্তিশালী এক সংযোজন। আজকের যুগটাই হলো বেতার ও টেলিভিশন তথা সম্প্রচার মাধ্যম নির্ভর। বেতারের আন্তর্জাতিক সম্প্রচার অথবা কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় টেলিভিশন আজ সারা দুনিয়া জুড়ে সর্বত্র ও সার্বজনীন মানবসংযোগ মাধ্যম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা জানার জন্য মানুষ এখন সংবাদবাহন হিসেবে সম্প্রচার মাধ্যমকেই বেছে নেয়। উন্নত বিশ্বে সম্প্রচার সাংবাদিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য; সেখানে মুদ্রণ আর সম্প্রচার সাংবাদিকতার মধ্যে কেমন যেন বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পুরনো অভ্যাসটিও পাল্টায়নি। সকালে চায়ের টেবিলে অথবা সন্ধ্যায় অফিস ফেরত যাত্রীর সংবাদপত্র না হলে চলে না; এ রকম হবারতো কথা নয়। সম্প্রচার সাংবাদিকতার দুই সহোদর বেতার অথবা টেলিভিশনতো খবর প্রচার করছে তাহলে আবার সংবাদপত্র কেন? প্রকৃতপক্ষে দু'ধরনের সাংবাদিকতার গুরুত্ব ভিন্ন ধরনের। মুদ্রণ অথবা ইলেক্ট্রনিক দু'মাধ্যমই আপন মহিমায় নিজেদের ভূমিকায় ভাস্বর।

'সংবাদ' আসলে 'সংবাদ' ছাড়া কিছু নয়। কোন মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো তা মুখ্য বিষয় নয়। মুদ্রণ বা সম্প্রচার যে মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হোক, দেখা দরকার দর্শক শ্রোতা পাঠকের সোজা কথায় জনগণের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছালো কিনা। সংবাদ সংগ্রহ করার ধরনে তিন রকমের গণমাধ্যমের রীতি একই। উপস্থাপন কৌশলে দু'ধরনের সাংবাদিকতায় ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। দু'ধরনের সাংবাদিকতায় বেশ কিছু মিল আছে সাংবাদিকতা শব্দটি নিয়ে; আর পার্থক্য হলো কাঠামোগত; চরিত্রের ভিন্নতা, দর্শক শ্রোতা, উপস্থাপন কৌশল এ সবকে ঘিরে।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণ ও সম্প্রচার সাংবাদিকতা ঃ পরস্পরের পরিপূরক

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, মুদ্রণ সাংবাদিকতা এবং বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতার মধ্যে মিল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে গরমিলও। দু'সাংবাদিকতার জন্ম, কাজের ধরন, পাঠক প্রভাবন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেও একটির পাশে অন্যটির বিকাশ পরস্পরকে পরিপূরক করে তুলেছে। এবার এ দিকটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বেতার সাংবাদিকতার যখন শুরু হলো নৈরাশ্যবাদী সমালোচকরা তখন শংকিত হয়ে উঠলেন। তারা মনে করলেন, এবার বুঝি মুদ্রণ সাংবাদিকতা রসাতলে গেল। না, সংশয়বাদীদের এই সংশয় বাস্তব হয়নি। আবার, টেলিভিশন সাংবাদিকতা শুরু হলে এই সমালোচকের দল বলেই ফেলল, এবার আর রক্ষে নেই সংবাদপত্রগুলোর। না, কিছুই হয়নি; সবই ঠিক আছে। সংবাদপত্র বেতার বা টেলিভিশন তিন মাধ্যমেই স্বনিয়মে রয়ে গেল, বিকশিত হলো। বেতার, টেলিভিশন যেমনি সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা কমাতে পারেনি তেমনি সংবাদপত্রও ঐ দু'মাধ্যেমের বিকাশ থামিয়ে দিতে পারেনি; বরং গবেষণায় দেখা গেল বেতার টিভির উদ্ভাবনের পর সংবাদপত্রের প্রচার আরো বেড়ে গেছে। মার্কিন Professor Arene Rae এক সমীক্ষায় দেখেন যে, বেতার আবিষ্কারের পর সংবাদপত্রের প্রচার বেড়ে গেছে। তিনি এর কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন, "বেতারের সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনে তা আরো বিস্তৃতভাবে জানার জন্য মানুষ সংবাদপত্র কেনে; যা পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে।"

প্রফেসর Rae যে তথ্যটি বেতারের ক্ষেত্রে পেয়েছেন তা টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আরো জোরালোভাবে প্রযোজ্য। বেতার বা টিভিতে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন সম্ভব নয়। দু'মাধ্যমের সংবাদ অনেকটা শিরোনামের মত। অন্যদিকে সংবাদপত্র গুলো যে কোনো সংবাদকে বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরে। পাঠক বেতার-টিভি দ্বারা সংবাদ সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় এবং সে আকর্ষণের কারণে অর্থাৎ সংবাদটি সম্পর্কে আরো বাড়তি তথ্য জানার জন্য সংবাদপত্রের দিকে ঝুঁকে। দু'মাধ্যম একে অন্যের শূন্যস্থান পূরণ করে, পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সংবাদ তৃষ্ণা নিবারণে যৌথ প্রয়াস চালিয়ে যায়। সম্প্রচার মাধ্যমগুলো কোন ঘটনা ঘটার অল্পকিছু সময়ের ব্যবধানে সংবাদটি তার দর্শক শ্রোতাকে পৌছে দিতে সক্ষম। কিন্তু মুদ্রণঃ মাধ্যমের সে ক্ষমতা নেই। ফলে এটা পূরণ করছে সম্প্রচার মাধ্যমগুলো। অন্যদিকে বিস্তৃত সংবাদ পরিবেশনে সম্প্রচার মাধ্যমগুলোর অক্ষমতা পূর্ণ করছে মুদ্রণ মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

কারো কারো ধারণা ছিল, সম্প্রচার মাধ্যম মুদ্রণ মাধ্যমের সংবাদের বিস্তৃত অঙ্গনকে সীমিত করে ফেলবে। বাস্তবে তো তা হয়ই নি, বরং সম্প্রচার মাধ্যম নিজেই মুদ্রণ মাধ্যমের সংবাদ উৎসে পরিণত হয়েছে। সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে উল্টা-পাল্টা বা বিতর্কিত কিছু পরিবেশিত হলে পরদিন পত্রিকায় তার সমালোচনা চলে আসে। মোটকথা সম্প্রচার ও মুদ্রণ উভয় মাধ্যমই চেষ্টা করছে সাংবাদিকতাকে চূড়ান্ত অগ্রগতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে। উভয় মাধ্যম সাংবাদিকতাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে তুলে ধরে সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করছে। একটি যেখানে দুর্বল, অন্যটি সেখানে সবল হওয়ার চেষ্টা করছে। তাই বলা যেতে পারে, সংবাদের কাঠামো, পরিবেশনা পদ্ধতি কিংবা অবস্থানগত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও এ দু' মাধ্যম একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা নয় এবং একটি অন্যটির পরিপূরক।

সম্প্রচার ও মুদ্রণ মাধ্যম ঃ কোনটি গুরুত্বপূর্ণ

উপরের আলোচনাতে দেখা যায়, সম্প্রচার ও মুদ্রণ দুটো মাধ্যম পরস্পর থেকে আলাদা নয়; একটা যোগসূত্রে আবদ্ধ। এছাড়া দুটো মাধ্যম পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। একটি যেখানে অসফল অন্যটি সেখানে সাফল্য লাভের চেষ্টা করছে। এবার কোন মাধ্যমটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা দেখা যাক। কিন্তু সমস্যা হলো এ গুরুত্ব বিচারের মাপকাঠি কি হবে ? প্রথম কথা হলো, গুরুত্ব বিচারের স্বীকৃত কোনো মাপকাঠি নেই। যা সমস্যাটিকে আরো জটিলতর করে তুলছে। অন্যদিকে, এ দুটি মাধ্যম একটি অন্যটির সাথে এত সম্পর্কযুক্ত যে গুরুত্বে পক্ষপাতিত্ব করা বেশ কঠিন।তবুও কোন মাধ্যমটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমত ঃ দুটি মাধ্যমেই পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে তথ্য বা সংবাদ জানানোর কাজে ব্যস্ত। পাশাপাশি দু' মাধ্যমই গ্রাহকদের বিনোদন দানে, শিক্ষা প্রদানে এবং প্রভাবনে ব্যস্ত। এগুলো এ দু, মাধ্যমের মুখ্য কাজও। কিন্তু একাজগুলো করতে গিয়ে সম্প্রচার মাধ্যম আজ একটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সম্প্রচার মাধ্যম কি বেতার, কি টেলিভিশন, দুই-ই-খুব দ্রুত শ্রোতা-দর্শককে সংবাদ জানাতে পারে। ফলে গ্রাহক অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ খুব তাড়াতাড়ি এবং একবারে টাটকা সংবাদটি জেনে যেতে পারে। সম্প্রচার মাধ্যমের চেয়ে মুদ্রণ মাধ্যমের এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ সম্প্রচার মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। এর কারণ, এতে তথ্যের সাথে সাথে চলমান চিত্রও (টেলিভিশনে) প্রদর্শিত হয়। ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

তৃতীয়ত ঃ সম্প্রচার মাধ্যমে যে বিনোদন দেয়া সম্ভব, মুদ্রণ মাধ্যমে তা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। সম্প্রচার মাধ্যমের বিনোদন অনেক বেশি জীবন্ত জীবনের অনেক বেশি কাছাকাছি।

চতুর্থত ঃ মুদ্রণ মাধ্যম থেকে তথ্য আহরণের জন্য অবশ্যই লেখা পড়া জানা থাকতে হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার দরকার পড়ে। সম্প্রচার মাধ্যমে এ সমস্যা নেই। রেডিও শোনার জন্য বা টেলিভিশন দেখার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হলে ও চলে।

পঞ্চমত ঃ বেতার শোনার জন্য খুবই স্বল্প ব্যয় করতে হয়। আমাদের দেশে ৮০ থেকে ৯০ টাকায়ও রেডিও সেট কেনা যায়। সংবাদপত্র কেনার ক্ষেত্রে ও ব্যয় তুলনামূলক কম। অন্যদিকে, টেলিভিশন সেট এখন কিছুটা ব্যয়বহুল। এছাড়া এতে আছে মূলধন খাটানোর মত বাড়তি বোঝা। তাই মুদ্রণ মাধ্যম কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ সংবাদপত্র বদল করে রুচি পরিবর্তন করা যায়। কোনো বিশেষ পত্রিকা পড়া বাদ দিয়ে অন্য একটি পড়া যায়। পাঠকের এ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু একই পত্রিকা পড়ে রুচি বদলের খুব একটা সুযোগ নেই মুদ্রণ মাধ্যমে। অন্যদিকে বেতার স্টেশনগুলোর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির জন্য যে বহির্বিশ্ব অনুষ্ঠান প্রচার করে তা শোনা যায় এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে উপগ্রহের বদৌলতে কত বিচিত্র অনুষ্ঠানই না দেখা সম্ভব। এক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতার রুচি পরিবর্তন বা নির্বাচনের স্বাধীনতা বেশ ভালোই।

সপ্তমত ঃ সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারে সময়ের কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। সংবাদ পত্রগুলো কলেবরে বেড়ে তাদের Newshole যদি বাড়াতে পারে তাহলে সম্প্রচার মাধ্যম তাদের সময় কেন বাড়াতে পারবে না ? এক্ষেত্রে সময় বাড়ানো গেলে প্রচুর সংবাদ প্রদান সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী অনুষ্ঠানের ক্ষতির জন্য বেতার ও টেলিভিশন প্রচার সময় বাড়াতে চায় না।

অষ্টমত ঃ সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদকে বা কোনো কিছুতে যত আকর্ষনীয় ও চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপন সম্ভব, মুদ্রণ মাধ্যমে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। এছাড়া মুদ্রণ মাধ্যম বিকশিত হতে হতে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ফলে এর বিচিত্রতায়ও যেন ভাটা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রচার মাধ্যম কেবল বিকশিত হতে শুরু করেছে- এর সুবিশাল ভবিষ্যৎ সামনে পড়ে আছে। এদিক থেকে সম্প্রচার মাধ্যম সম্ভাবনাময়, মুদ্রণ মাধ্যম তত তাড়াতাড়ি এবং গভীরভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এর পাঠকদের উপর যত তাড়াতাড়ি ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সম্প্রচার মাধ্যমগুলো এদের দর্শক শ্রোতাদের উপর তা পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, সম্প্রচার মাধ্যম দু'টি সুবিধা এবং সম্ভাবনাময়ভাবে এগিয়ে আছে। মুদ্রণ মাধ্যমের যে সুবিধা বা সম্ভাবনা নেই তা নয়। সত্যি কথা হলো একটি অন্যটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজের জন্য দু'টিরই সমান দরকার। তবে তুলনামূলক গুরুত্বের বিচারে সম্প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ বেতার ও টেলিভিশন সংবাদপত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত মতামতের আদান প্রদান; একজনের সাথে আরেকজনের আলোচনা সামাজিকভাবে আলোচনা মিটিং, সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে যে প্রচার চলে তাই এ গণমাধ্যমের আওতাভূক্ত।

লোকজ মাধ্যমে গান, সারীগান, জারী গান, পুঁথি, কবিতা, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি প্রভৃতি এ মাধ্যমের অন্তর্গত।

ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি,সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস অপসংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা প্রভৃতিক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং সমাজের দর্পন হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরার ক্ষেত্রে সামাজিক এ্যাডভোকেসী একটি পরিপূরক বা সহায়ক মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন মিডিয়া। এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে মিডিয়ার বিকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোকে তুলে ধরা এবং সমাজ ও গণমাধ্যমের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, সমাজে যেভাবে দুর্নীতি, সন্ত্রাস বিস্তার করছে। পূর্বেও ছিল কিন্তু (গত চারদশক পূর্বেও) তা ছিল মূলতঃ নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তখন সন্ত্রাসের হাতিয়ার ছিল বাঁশ, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি। এখন সে স্থান দখল করে নিয়েছে অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র/আগ্নেয়াস্ত্র। সন্ত্রাস এখন কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এক্ষেত্রে এ কে ৪৭ রাইফেল, গান পাউডার, রকেট লাঞ্চার সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র উল্লেখযোগ্য।

সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য যে জিনিসটা জরুরী তা হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কমিটমেন্ট, সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিত করা। এটা প্রতিষ্ঠিত করা গেলে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব। এর জন্য সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

মানবিক কর্মকাণ্ডে পরিচালিত এবং সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ, রাজনীতি, স্থানকাল পাত্রভেদে এবং চাহিদার ওপর নির্ভর করে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তন ঘটতে পারে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

যখন কোন ব্যক্তি তার নিজ উদ্যোগে এ্যাডভোকেসী করেন তখন তাকে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী বলতে পারি। ব্যক্তি পর্যায়ে এ্যাডভোকেসীর গুরুত্ব একটু আলাদা। যেমন হযরত মোহাম্মদ (স) মুসলমানদের নবী হিসেবে ব্যক্তি কেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে 'মুসলিম' মর্যাদায় আসীন হয়েছিল। অন্ধকার যুগে মানুষ যখন হানাহানি, খুন-খারাবী, শিশু হত্যা, জীবন্তকবর দেয়া, প্রভৃতি নানামুখী অপরাধে লিপ্ত ছিল ঠিক তখনই আল্লাহর নির্দেশে হযরত মোহাম্মদ (স) আবির্ভূত হন মানবকুলের শান্তির দুত হিসেবে। তিনি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এটা অন্যায়। এ থেকে সকলের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এক পর্যায়ে সমাজের সকল স্তরে শান্তি ফিরে এসেছিল এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে বর্তমান প্রেক্ষাপটেরও পরিবর্তন সম্ভব।

এভাবেই কৃষ্ণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন ব্যক্তি পর্যায়ে যা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'রই আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে বিভিন্ন মনীষী, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী, শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী শুরু করেন যা অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সাংগঠনিক পর্যায়ে গড়িয়েছে।

পারিবারিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

ব্যক্তি পর্যায়ের পর পরিবার হল সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সাধারণ অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে নিয়ে যে সংস্থা গড়ে ওঠে তাকে। তবে স্বামী স্ত্রীকেই প্রধানতঃ পরিবার বলা চলে। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে সন্তানরা তার বাবা মা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যদি ভাল শিক্ষা পায় তবে তারা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। নৈতিকভাবে মূল্যবোধের আলোকে নিজেদের জীবনকে সাজাতে পারে। সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে একসময় দেশ ও জনগণের সেবায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতেও পারে। সুতরাং দেখা গেল পারিবারিক সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর গুরুত্বও অনেক। যার মাধ্যমে একটা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত করা সহজ হতে পারে।

সামাজিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

সামাজিক পরিবর্তন উন্নয়নমুখী প্রশাসনের একটি অন্যতম উপাদান। সামাজিক পরিবর্তন হল সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে সংহতি রক্ষা করে জনগণের মানসিক অবস্থা ও আচরণে পরিবর্তন সাধন। উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সামাজিক পরিবর্তন অপরিহার্য। যদিও তা অত্যন্ত জটিল। এর জন্য কোন আদর্শ সমাধান নেই, তবে দু'টি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম, প্রশাসক ও জনসাধারণের বিশেষ করে জনসমষ্টির যে অংশ (the clientele groups) প্রশাসকদের কাজের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সার্বক্ষণিক এক যোগসূত্র (a process of continuos interaction) স্থাপন করা দরকার। দ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠান গঠনের (institution building) সার্থক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে জনগণের অংশগ্রহণ উন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্যের চাবিকাঠি। কতকগুলো কার্যক্রম রয়েছে যেক্ষেত্রে জনগণের মানসিক অবস্থা ও আচরণে পরিবর্তন আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, এসব ক্ষেত্রে যথার্থ ফল লাভ করতে হলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু জনগণের মানসিক পরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিকট থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদায় করার সামর্থ্য। ল্যাভোয় মতে, সামাজিক পরিবর্তনের এ অধ্যায়ে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক মধ্যবর্তী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। উদাহরণস্বরূপ, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা নিজেদের গ্রামে কোন সমবায় সংস্থার নিকট থেকে কৃষির উপকরণ লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করলেও এ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ ধরনের বহুসংখ্যক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মধ্যবর্তী সংগঠন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণঃ (এক) এদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনগণের মধ্যে যে দূরত্ব আর সংবাদ আদান প্রদান ক্ষেত্রে যে ব্যবধান তা দূর হতে পারে। (দুই) এসব সংগঠনের মাধ্যমে জনগণ তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হতে পারে ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবশ্য মধ্যবর্তী সংগঠনের সংখ্যা অত্যন্ত কম আর সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত এ ধরনের সংগঠন গড়ে উঠার সম্ভাবনাও কম। সরকারী উদ্যোগের ফলে মধ্যবর্তী সংগঠন গড়ে উঠলে সেগুলো প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অন্যদিকে সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত এদের গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। তবে উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কর্মকর্তারা জনগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত করে আর নিজেদের কার্যক্রম জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে জনগণের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করতে পারেন ও জনগণের উদ্যোগে বহুসংখ্যক মধ্যবর্তী সংগঠনের পথ প্রশস্ত করতে পারেন।

উন্নয়নমুখী প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল মানুষ প্রশাসনিক এলিট। প্রশাসনিক কর্মকর্তা যদি নতুনভাবে চিন্তা না করেন অথবা নতুনভাবে যদি কার্য করতে তিনি উদ্বুদ্ধ না হন তাহলে সামাজিক পরিবর্তনের পথনির্দেশক হিসেবে তিনি তাঁর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন না। তাই সর্বাগ্রে কর্মকর্তাকে প্রচলিত ধ্যান ধারণার রুদ্ধ আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে আর অতীতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শাসন ব্যবস্থার আওতা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার আলোকে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। তাই উন্নয়নমুখী প্রশাসনের জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে "মানুষটিকে" উত্তম প্রশাসনের বহু উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের বহুবিধ লক্ষ্য রয়েছে। মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বা পেশাগত বিষয়ে দক্ষ করবার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণের রূপরেখা হবে "ঠিক বাগানের মালি যেমন ছোট চারা গাছটিকে বিশেষ দিকে বা বিশেষ আকৃতিতে গড়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় পাতা বা ডাল কেটেছেটে তাকে মুক্তভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জনসংযোগ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবার জন্য জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে আর যে ভাষা বা প্রতীক জনগণের নিকট বোধগম্য তা আয়ত্ত্বে আনতে হবে। উন্নয়নশীল দেশে "জনগণের জন্যই উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ।" সুতরাং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে হবে, বিশেষ করে জনগণকে সামাজিক পরিবর্তন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

রাজনৈতিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

উন্নয়নমুখী প্রশাসনের রাজনৈতিক ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ভূমিকায় জনগণের প্রতি প্রশাসনের যে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তা পালন করে আর সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে জনগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সৃষ্টি হয় তার মীমাংসা করে। সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই অংশ, কেননা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ব্যতীত দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। অথবা বেকারত্বের অভিশাপ থেকেও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি না হলে জনগণের মধ্যে দারিদ্র্যই বণ্টন করা হয়। কিন্তু তথাপি এটা বলতে হবে—সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। এর জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কিভাবে অর্জিত হবে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেন, কিন্তু তাদের সুপারিশে বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি তেমন গুরুত্ব নেই। বণ্টন ও অনুরূপ সমস্যা মূলতঃ রাজনৈতিক আর এ বিষয়ে নীতি নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক এলিটদের দ্বারা। নীতি স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমন কতগুলো কাঠামোগত, কার্যগত ও আচরণগত (structural, behavioral and attitudinal) প্রতিবন্ধক রয়েছে যা সমাজে পরিবর্তনের তথা বণ্টনের পথ রুদ্ধ করে। দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রণীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের স্বার্থসিদ্ধ করেছে। বিত্তশালী মহাজনদের কবল থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো অচিরেই গ্রাম্য মাতব্বরদের (village oligarchs) নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। পানি সেচের ব্যবস্থা দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের এতটুকু উপকার করে না ও 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) যেখানেই সফল হয়েছে সেখানেই তা ধনী

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকদের আরও ধনী করেছে। যে সকল আইন ও বিধিবিধান ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তা ভূমিহীনদের কোন উপকারে আসেনি।

এ প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, উন্নয়নমূলক কার্যাবলীকে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে নীতি প্রণয়নের সাথে নীতি বাস্তবায়নের এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেন দরিদ্র জনসাধারণ তার অংশীদার হতে পারে ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজে ক্ষমতা ও শ্রেণী ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে। অন্য কথায়, সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতায় দরিদ্র জনসাধারণের অংশ নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের "আদর্শগত অঙ্গীকার" (ideological commitment) ও তাদের স্বচ্ছ উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি (development orientation)।

সংক্ষেপে, উন্নয়নমুখী প্রশাসন হচ্ছে একটি লক্ষ্যভিত্তিক ও কর্ম-চঞ্চল প্রশাসন ব্যবস্থা। সনাতন বা গতানুগতিক প্রশাসন ও উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতাল। আর এ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কাঠামো, কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মৌল দায়িত্ব উন্নয়ন অর্জন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসনকে সুসজ্জিত হতে হবে ও চারদিকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ চারটি দিক হচ্ছে নীতি প্রণয়ন, পরিচালনা, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ভূমিকা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার, শক্তির লড়াই, দখল, পাল্টা দখল, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বেড়েই চলেছে। সারা বিশ্বে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাই এ ব্যাপারে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীকে উন্নত করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর ধারা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ন্যায়পরায়ণ সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী এবং সঠিক দিক নির্দেশনা পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র কয়েকটি কেস স্টাডি

৬.১ পলিথিন ঃ

পলিথিন শপিং ব্যাগ তথা প্লাষ্টিক ও এ জাতীয় পণ্য আজ আমাদের সমাজে মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপদ থেকে আমাদের পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার আন্দোলনে শরিক হয়েছে সারা বিশ্বের পরিবেশ ও মানবতাবাদীরা। ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এসডো পরিচালিত জনমত জরিপ ও গবেষণার ফলাফল এবং বিশ্বব্যাপী পলিথিন বিরোধী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমন্বয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এসডোর একদল তরুন পরিবেশবাদী কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে জনস্বার্থে এই প্রকাশনা। প্রকাশনাটি মানুষের মধ্যে শুধু সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়, গবেষণার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে। এর পিছনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী তাঁরা হচ্ছেন– শাহনাজ মনির, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, সিদ্দিকা সুলতানা, সাহেদা নাসরীন, মাহফুজুল কবীর, আব্দুস-সামাদ আজাদ, ইমদাদুল হক ইমাদ, মতিউর রহমান এবং অনুপম। যারা সুচিন্তিত মতামত ও আন্ত রিকতা দিয়ে এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ, তাহিয়া হক, সৈয়দ তামজিদুর রহমান, ড. মাহফুজুর হক, মোঃ নুরুল ইসলাম এবং এ, জেড, এম শহীদুল্লাহ।

পলিথিন কি?

পলিথিন বা পলিইথিলিন হল এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা ইথিলিন পলিমারের (সমরূপ হাইড্রো কার্বনের চেইন) সমন্বয়ে তৈরী। এই পলিইথিলিন ব্যাগ ও প্যাকেজিং সামগ্রী প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

পলিথিনের বৈশিষ্ট্য

- পলিথিন একটি জটিল জৈব-রাসায়নিক যৌগ।
- এই যৌগের রাসায়নিক নাম ইথিলিন পলিমার।
- এতে সমরূপী হাইড্রোকার্বন (ইথিলিন) একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

- এর গলনাঙ্ক ১২০-১৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
- পলিথিন একটি অপচনশীল পদার্থ।
- পলিথিন পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পলিথিন ব্যাগের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৮৬৯ ঃ বাণিজ্যিকভাবে প্লাষ্টিক উৎপাদন শুরু হয়।

১৮৮৯ ঃ ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের জন্য প্লাষ্টিকের ব্যবহার শুরু করে।

১৯৫৮ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন এবং ব্যবহার শুরু হয়।

১৯৬২ ঃ এশিয়ায় পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়।

১৯৬৩ ঃ এশিয়ায় মহাসাগরীয় অঞ্চলে উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়।

১৯৭৪ ঃ পূর্ব এশিয়ায় উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়।

425525

বাংলাদেশে আগমন, উৎপাদন ও ব্যবহার

১৯৮২ ঃ বাংলাদেশে প্রথম পলি ব্যাগের আগমন ঘটে।

১৯৮৩ ঃ বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু। প্রথম ফ্যাক্টরী ইসলাম প্লাষ্টিক, বেগম বাজার, ঢাকা। শুরুতে দৈনিক উৎপাদন ছিল ০.২৫ টন, বর্তমানে দৈনিক উৎপাদন ৫.৫ টন।

১৯৮৪ ঃ রাজধানী ঢাকায় আরও ১৬টি পলি ব্যাগের কারখানা গড়ে উঠে।

১৯৮৬ ঃ চট্টগ্রাম ও সিলেটে উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৩০০ পলি ব্যাগ তৈরীর কারখানা রয়েছে। শুধু রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছে ২১০টি কারখানা।

১৯৯৩ ঃ রাজধানী ঢাকায় প্রায় ১৪ লক্ষ পরিবারের প্রতিদিন ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ লক্ষ।

২০০০ ঃ রাজধানী ঢাকার প্রায় ১৭ লক্ষ পরিবার দৈনিক ৫টি করে পলিথিন ব্যাগ ফেলে দেয় এবং প্রতিদিন ঢাকায় আগত প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ ২টি করে ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ ফেলেন। এ হিসাবে দৈনিক প্রায় ৯৫ লক্ষ, মাসে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ এবং বছরে প্রায় ৩৪২ কোটি পলিথিন ব্যাগ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জমা হচ্ছে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পলিথিন ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

(ক) পরিবেশের ওপর

- পলিথিন অপচনশীল পদার্থ বলে দীর্ঘদিন (প্রায় ৪০০ বছর) প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়।
- ব্যাকটেরিয়া, কর্তৃক পচন ঘটে না বলে পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহের বিস্তার কমে যায়।
- পলিথিন/প্লাষ্টিক জৈব বৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেমন এটি বনজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও কীট পতঙ্গের স্বাভাবিক বিস্তার ও চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে।

(খ) কৃষির ওপর

- মাটিতে সূর্যালোক, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।
- পচে না বলে মাটির উর্বরা শক্তি কমে যায়। উপকারী ব্যাকটেরিয়াদের বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে।
- জমিতে হাল দেওয়ার সময় বাধা সৃষ্টি হয়।
- আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় বলা হয়েছে- পলিথিন ও প্লাষ্টিকজাত সামগ্রী মাটির সংস্পর্শে এসে ধান, গম ও সরিষা প্রভৃতি ফসলের চাষের উপকারী বলে বিবেচিত এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াদের হত্যা করে।

(খ) নির্মাণ কর্মকাণ্ডে

- পলিথিন ইমারত ও পথ-ঘাট নির্মাণের জন্য বর্তমানে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
- মাটির নীচে চাপা পড়া পলিথিন ও প্লাষ্টিক মাটির গুণগত উপাদান নষ্ট করে। ফলে দেখা যায়, যে সব জায়গায় দীর্ঘদিন পলিথিন জমেছে সেখানকার মাটির দানা বাঁধার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে মাটি বালিমাটিতে পরিণত হচ্ছে। এ ধরনের মাটিতে ভবন বা রাস্তাঘাট নির্মিত হলে তা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) জনস্বাস্থ্যের ওপর

- পলিথিনে মোড়ানো খাদ্য সামগ্রী স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রঙিন বা কালো পলিথিন তৈরীতে যে রাসায়নিক ও ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার করা হয় তা খাদ্য সামগ্রীতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

- বিশেষজ্ঞদের মতে দীর্ঘদিন পলিথিনে মোড়ানো খাদ্য গ্রহণ করলে ক্যান্সার এবং চর্মরোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। তাদের মতে পলিথিনে মাছ ও মাংস প্যাকিং করা হলে অবায়বীয় (এনারোবিক) ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়, যা মাছ ও মাংস দ্রুত পচনে সহায়তা করে।
- বাড়ির আশেপাশে পড়ে থাকা পলিথিনে পানি জমে মশার প্রজননের উত্তম ক্ষেত্র তৈরি করে। যা ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশার বিস্তার ঘটায়।
- লেবু মিশ্রিত কিংবা প্লাষ্টিক বা পলিকাপে খেলে বিরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। কারণ গরম চা ও লেবুর সাইট্রিক এসিড প্লাষ্টিক বা পলিকাপের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, যা পাকস্থলির স্বাভাবিক হজম প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি আলসার ও ক্যান্সার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। (ডাঃ শাশ্বতী রায়, নিউট্রিশনিষ্ট, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)।
- পিভিসি এবং অন্যান্য প্লাষ্টিক জাতীয় আবর্জনা ৭০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে পোড়ালে ডাইক্সিন জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। জন্মাগত ত্রুটি, চর্মরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি মারাত্মক রোগের জন্য এই ডাইক্সিনকে দায়ী করা হয়। (খান, এম.এ. ইন ডার্ক এবাউট এ ড্রেড ফল্ড ডাইক্সিন, ডেইলী স্টার, ২২ ডিসেম্বর ২০০০)
- স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পলিথিন পোড়ালে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়নাইড গ্যাস নির্গত হয়। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।
- পলিথিন ও প্লাষ্টিক ব্যাগ শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। খেলার ছলে শিশুরা এ ধরনের ব্যাগের মুখোস ব্যবহার করে শ্বাস কষ্ট জনিত সমস্যা এমনকি বড় ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।

(ঘ) অর্থনীতির ওপর প্রভাব

- পলিথিনের সর্বব্যাপী ব্যবহারের ফলে পরিবেশে সম্মত পাট সামগ্রীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে, ফলে একদিকে কৃষকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি বিরূপ প্রভাব পড়ছে অর্থনীতির ওপর।
- ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিশ্বের পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে। ১৯৮৩ তে এসে

Dhaka University Institutional Repository

পলিথিন আগ্রাসনের ফলে পাট শিল্পে বিপর্যয় শুরু হয়। ঐ সময়ই বাংলাদেশকে পিছনে ফেলে প্রতিবেশী দেশ ভারত শীর্ষ অবস্থানটি দখল করে।

- ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী করে বছরে প্রায় এক হাজার থেকে পনের শ' কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করত। যা জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।
- বর্তমানে পলিথিন ও প্লাষ্টিক সামগ্রী রপ্তানী করে বছরে প্রায় পাঁচশ' থেকে সাতশ' কোটি টাকা আয় হচ্ছে (পলিথিন ও প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী কারক এসোসিয়েশনের মতে)। তবে এ আয়ের সিংহভাগ মুনাফা চলে যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে, ফলে এই মুনাফা বা আয় কোনভাবেই জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে না।
- ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে পাটকলের সংখ্যা ছিল ৮৭টি। এই সব মিলে কর্মরত নিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ হাজার, অনিয়মিত ১৫ হাজার। মোট প্রায় ৪১ হাজার। দেশের প্রায় ৯৯ ভাগ কৃষকই পাট চাষের সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে পলিথিন আগ্রাসন ও অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অধিকাংশ পাট কল বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার শ্রমিক হয়েছে বেকার। বর্তমানে চালু পাটকলের সংখ্যা সরকারী পর্যায়ে ৯টি ও বেসরকারী পর্যায়ে ১৬টি। আংশিক চালু রয়েছে সরকারী পর্যায়ে ২০টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ১২টি। কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৭৫ ভাগই এখন আর পাট চাষ করে না। ফলে দেখা যাচ্ছে পলিথিন কেবল আমাদের পরিবেশ, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই ব্যাহত করছে না, আমাদের অর্থনীতিকেও গ্রাস করছে।
- ১৯৮৩-৮৬ সালের মধ্যে শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই কাগজের ঠোঙ্গা এবং বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক দুই শতাধিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, বেকার হয়ে যায় ১০ হাজার শ্রমিক।
- পলিথিন কেনার পেছনে অর্থ ব্যয় করে ব্যক্তিগতভাবেও মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একজন ক্রেতা মাসে কমপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পলিথিন ব্যাগের পেছনে ২০ থেকে ২৫ টাকা ব্যয় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) অন্যান্য প্রভাব ঃ

- শহর এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন নালায় পলিথিন জমে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে তোলে।
- আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কৃষি বিজ্ঞানী ড. কে. ন্যাথান এর মতে, পলিথিন ও প্লাষ্টিকজাত সামগ্রী মাটির সংস্পর্শে এসে মাটির দানা বাধার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে এ ধরনের স্থানে নির্মিত সড়ক অথবা ভবনে ফাটল এমনকি ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বাংলাদেশে পলিথিন বিরোধী আন্দোলন

- ১৯৮৯ ঃ কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে পলিথিন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত।
- ১৯৯০ জনসচেতনতার জন্য প্রচারণা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু।
- ১৯৯১ ঃ এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো) গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে।
- ১৯৯২-৯৩ ঃ ব্যাপক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে এসডো পলিথিন বিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়।
- ১৯৯৩ ঃ সালের শুরুর দিকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এ আন্দোলনে এসডোর পাশে এসে দাঁড়ায়।
- এসময়ে দেশের ৪টি বিভাগীয় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পৌরসভায় এ ইস্যুতে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশে আন্দোলনের সাফল্য

- প্রথম সাফল্য ঃ এসডো'র পলিথিন বিরোধী আন্দোলন যৌক্তিকতা লাভ করে ১৯৯৩ সালে, যখন ঐ বছরের ১১ অক্টোবর তারিখে মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৪ এর পরে "রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা ব্যতীত পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলো।" কিন্তু চূড়ান্ত সময়সীমার মাত্র ৪ দিন পূর্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্তটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পলিথিন বিরোধী আন্দোলনকে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত "সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" (SEMP) এর অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
- ৩০ অক্টোবর, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের সভায় প্রথম পর্যায়ে কালো পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারী ২০০১ সালের পরে বাংলাদেশে কালো পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার ও আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে (তবে শেষ মুহূর্তে সরকার এই সিদ্ধান্তটিও স্থগিত করে)। পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পলিথিনমুক্ত হবে।
- ৩০ জুন, ২০০০ সালে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সে এনজিও প্রতিনিধি হিসেবে এসডো'র অন্তর্ভুক্তি।
- ইতিমধ্যেই পলিথিন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে।
- ২ ফেব্রুয়ারী ২০০০ বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একুশের বই মেলায় পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এসডো'র সহযোগিতায় একাডেমি কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করেন। বর্তমানে এই সিদ্ধান্তটি একুশে বইমেলার জন্য একটি অবশ্য করণীয় সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে।
- ৫ জুন ২০০০ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার ওসমানি মেমোরিয়াল হলে পরিবেশ মেলাটি ছিল সম্পূর্ণ পলিথিনমুক্ত। এসডোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমবারের মত কোন সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কার্যক্রমে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।
- ১৮ মে ২০০১ সিলেট পৌরসভা এলাকায় পলিথিন উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও পৌরসভা যৌথভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

- ১ জুন ২০০১ ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আয়োজন করা হয় র‍্যালি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম। সেনা সদস্যবৃন্দ এবং সেনানিবাস এলাকায় বসবাসরত নাগরিকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। দিনটিকে চিহ্নিত করা হয় পলিথিনমুক্ত দিবস হিসেবে। বর্তমানে সেনানিবাস এলাকায় পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ১০ জুলাই ২০০১ ঠাকুরগাঁও এর স্থানীয় জনগণ ও জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও পৌর এলাকায় পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।
- বর্তমানে পলিথিনের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে সংবাদপত্র ও রেডিও টেলিভিশনে প্রচারণার হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার ১৯৯৫ এর তুলনায় প্রায় ৮০% শতাংশ। বর্তমানে পলিথিন বিরোধী আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সারাদেশের প্রায় দুই সহস্রাধিক বেসরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠান ক্লাব ও পেশাজীবী সংগঠন পলিথিনবিরোধী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এদের মধ্যে সরাসরি এসডো'র নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে প্রায় দুই শতাধিক সংগঠন। আশার কথা, সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও পলিথিন বিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সাফল্য

- ৩০ অক্টোবর, ১৯৯৩ ঃ বাংলাদেশে এসডোর পলিথিন বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে ৫০০ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনকারী কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়।
- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ঃ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'অশোকা ইনোভেটর ফর দা পাবলিক' এসডো'র পলিথিন বিরোধী আন্দোলনকে যৌক্তিক কার্যক্রম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে এই কার্যক্রম তুলে ধরতে সহায়তা প্রদান করে।
- ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ঃ জাপান ও কোরিয়ায় পলিথিনে খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং শপিং ব্যাগের ব্যবহার সীমিত করার নির্দেশ দেয়া হয়।
- ১৮ আগস্ট, ১৯৯৫ ঃ গ্রীনপিস ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে এসডো'র পলিথিন বিরোধী আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং গ্রীনপিসের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে এই কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ ঃ অস্ট্রেলিয়ার সিডনী ভিত্তিক পরিবেশবাদী সংগঠন ক্লিন আপ দি ওয়ার্ল্ড এসডো'র এই কার্যক্রমকে তাদের মূল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার ঘোষণা প্রদান করে।
- অক্টোবর, ১৯৯৫ ঃ একযোগে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, কোপেনহেগেন এবং আমস্টার্ডমে ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ ইন্টারন্যাশনাল এসডো'র কার্যক্রমে স্বীকৃতি প্রদান করে পলিথিন বিরোধী আন্দোলনকে সংস্থার মূল নেটওয়ার্কে সম্পৃক্ত করার ঘোষণা দেয়।
- নভেম্বর, ১৯৯৭ ঃ ভারতের শিলং এ পলিব্যাগ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এক বছরের মধ্যে ঐ অঞ্চলে পলিব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের আদেশ জারি করা হয়।
- ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ঃ শিলং এ পলিব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়।
- সেপ্টেম্বর, ২০০০ ঃ ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যের রাজধানী মুম্বাই-এ পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
- অক্টোবর, ২০০০ ঃ ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা সিটি কর্পোরেশন ২০০১ সাল থেকে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আন্দোলনের বিরোধিতা

- ১৫ মে, ১৯৯২ ঃ এসডো'র পলিথিন বিরোধী র‍্যালীর দু'দিন পরেই পলিথিন উৎপাদনকারীদের পক্ষ থেকে সরাসরি এসডো'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তবে তাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না।
- অক্টোবর, ১৯৯৩ ঃ পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কিত মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতা শুরু হয়। তারা প্রকাশ্যে এসডো'র কর্মীদের নানাভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তারা সরকার এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভেতরে পলিথিন বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে এসডো'র প্রচার কার্যক্রমে বাধাদান, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলার কাজ থেকেও তারা বিরত ছিল না। এত কিছুর পরও তারা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতা ত্যাগ করে গোপনে নীতি নির্ধারণী মহলকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাতে থাকে,যা এখনও অব্যাহত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে এসডো পরিচালিত জনমত জরিপের ফলাফল

- ১৫ মে থেকে ১৮ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে এসডো "পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন বন্ধ এবং বিকল্প ধারণা" শীর্ষক একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করে। ঢাকা মহানগরীর ১৮টি থানা এলাকায় গৃহবধু, পেশাজীবী, ছাত্র-ছাত্রী এবং ব্যবসায়ীসহ মোট ১০,৭০০ জন নাগরিকের ওপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয়।
- ১৫ জানুয়ারী থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালে এসডো সারা দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে পলিথিন ব্যবহার ও উৎপাদনের উপর অপর একটি জনমত জরিপ করে।

  এই দুইটি জরিপের ফলাফল ছক ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রদর্শিত হল।

- পলিথিনের উৎপাদন সম্পর্কে জনগণের মতামত

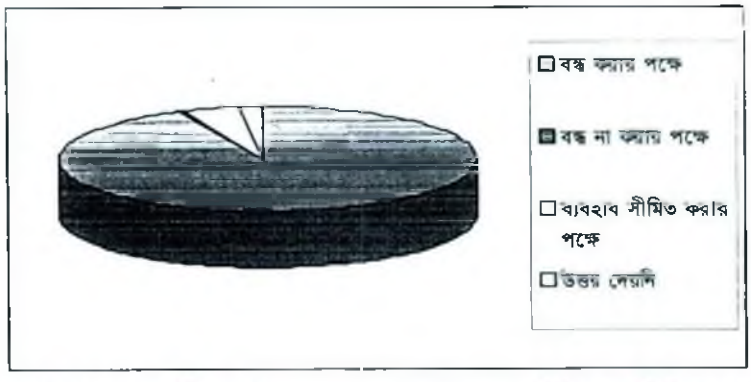

- জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতে পলিথিনের বিকল্প উদ্ভাবন করতে হবে।
- ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সালে এসডো সারা দেশের প্রধান প্রধান শহরে পলিথিনের ওপর অপর একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন এবং উৎপাদিত ব্যাগ সম্পর্কে উক্তগবেষণা প্রতিবেদনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

আমাদের করণীয়

পলিথিনের সম্ভাব্য বহুমুখী বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সর্বসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যা করতে পারি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডে নিজে অংশগ্রহণ করা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা।

- পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিহার করে রি-সাইকেলযোগ্য ব্যাগ অথবা আমাদের ঐতিহ্যবাহী পাট, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করা এবং সাথে সাথে অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।
- স্থানীয় সুপার মার্কেটগুলোতে প্যাকেজিং এ পলিথিন এবং প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমানোর আহবান জানানো।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রি-সাইকেলযোগ্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করা।
- কালো পলিথিনে মোড়ানো খাবার যেমন রুটি, বিস্কুট, মাছ, মাংস, সবজী দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দূষিত করে। তাই এখনই কালো পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।
- পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি সংগঠিত ও জোড়ালো দাবী জানানো।

৬.২ সুশাসন এ্যাডভোকেসী ঃ

একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের কোন বিকল্প নেই। অর্থাৎ সমতাপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থার জন্য সুশাসন অন্যতম প্রধান অপরিহার্য বিষয়।

আভিধানিক অর্থে সুশাসন বলতে বুঝায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বা ভাল শাসন। যেমন– বলা যায় যে, Governance, of course, is not only about the "organs" or actors. More importantly, it is about the quality of governance which expresses itself through such attributes as accountability, transparency, efficiency, employment, participation, sustainability, equity and justice.

অতএব, বুঝা গেল যে, সুশাসন বলতে বুঝায় এমন প্রশাসনকে যেখানে থাকবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, চাকুরীর নিশ্চয়তা, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, সমতা প্রভৃতি।

সুশাসন ছাড়া কোন সমাজ/রাষ্ট্র উন্নয়নের মুখ দেখতে পারে না। যেখানে সুশাসনের অভাব থাকবে সেখানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ গণতন্ত্রী রাজনীতিকদের অগণতান্ত্রিক মানসিকতায়, বিশেষ করে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটিরই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হয়। রাজনৈতিক সৌভাগ্য ও সুদিন নির্ভর করে রাজনীতিক তথা দেশ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সব মহলের সদিচ্ছা ও দেশের কল্যাণ সাধনের আন্তরিক প্রয়াসের উপর। পরমত সহিষ্ণুতার যে গুণটির আজ বড়ই অভাব, তার মনন ও অনুশীলন করতে হবে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতি, সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারেও সকলের সহযোগিতাপূর্ণ আচরণের প্রয়োজন এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে এটা অনেকাংশে সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত আজকের এ পৃথিবী। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে আসছে। সমাজ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস দূরীকরণে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা, সরকারের জবাবদিহিতা প্রভৃতি নিশ্চিতকরলেও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসীর বিকল্প নেই। যেখানে সারা বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা বা প্রতিষ্ঠা করা আজকের এই সময়ের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যই প্রয়োজন সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র। সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতার বিকাশ তথা একটি সুন্দর ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়তে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। অনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান এমন একটি সমাজে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসী'র মাধ্যমে নৈতিকতা তথা সামাজিক অন্যায় অবিচার দূর করা সম্ভব। সামাজিক এ্যাডভোকেসী এমন একটি কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব। প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মের প্রতি প্রত্যেকের শ্রদ্ধাবোধ এবং সহমর্মিতা থাকা একটি সুন্দর সমাজের জন্য জরুরী। তবে প্রধান জাতিসত্ত্বা বা ভৌগলিক অবস্থান বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে নয়। এখানে সামাজিক এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে সামাজিক বিভেদ দূর করার পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্যকে লালন করা সম্ভব। গণমাধ্যমকে সঠিকপথে পরিচালনা করা এবং সমাজের দর্পণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক এ্যাডভোকেসী একটি পরিপূরক বা সহায়ক মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ সামাজিক এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে মিডিয়ার বিকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোকে সমাজের কাছে তুলে ধরা এবং সমাজ ও গণমাধ্যমের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণালব্ধ ফলাফল

যুগের বিবর্তনে ও সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক এ্যাডভোকেসী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সামাজিক এ্যাডভোকেসীকে সংজ্ঞায়িত করাটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। এ্যাডভোকেসীকে দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও গোষ্ঠী বা সংগঠন কেন্দ্রীক বা সামাজিক এ্যাডভোকেসী। ব্যক্তিকেন্দ্রীক এ্যাডভোকেসী হল কোন সমস্যা সমাধানে যখন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে সমাধানে ব্রতী হয়। সামাজিক এ্যাডভোকেসী আসলে থিওরিটিক্যাল ডিসিপ্লিন তুলনামূলকভাবে নতুন। এটা বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাকে এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করাকে। এক কথায় সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াই হল সামাজিক এ্যাডভোকেসী অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি সমতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই-ই সামাজিক এ্যাডভোকেসী। সামাজিক এ্যাডভোকেসী'র উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট। ঐতিহাসিক, আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশ বা জাতীয় প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন সামাজিক এ্যাডভোকেসী এবং সরকারী উদ্যোগ, বেসরকারী সংস্থা, নৈতিকতা, উন্নয়ন, ধর্মান্ধতা, অপসংস্কৃতি, পুঁজিবাদ, জাতিসত্ত্বা। এগুলো সামাজিক এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে নেতিবাচক ইতিবাচক উভয় ভূমিকা পালন করে। সামাজিক এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে রয়েছে কয়েকটি মাধ্যম। এসব গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রোনিক্স গণমাধ্যম (বেতার, টেলিভিশন), মুদ্রণ গণমাধ্যম, লোকজন গণমাধ্যম, এবং ব্যক্তিগত মাধ্যম। মূলতঃ সামাজিক এ্যাডভোকেসী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সামাজিক এ্যাডভোকেসী করতে গিয়ে কয়েকটি কেস স্টাডি করতে হয়েছে। পলিথিন; সুশাসন এ্যাডভোকেসী প্রভৃতির উপর কেস স্টাডি পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচী

* Governance south Asian Perspectives edited by Hasnot Abdul Hye
* বাংলাদেশের রাষ্ট্র সমাজ ও দুর্নীতির অর্থনীতি–মইনুল ইসলাম
* অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা–এ.এইচ.এম. মাহবুবুল আলম
* সরকারের সমস্যাবলী–বিপুল রঞ্জন নাথ
* বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা–মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ
* বাংলাদেশ লোক প্রশাসন- অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ
* ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ
* গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাইকেল নোভাক, অনুবাদ সম্পাদনায় ড. আনিসুজ্জামান, আফতাব হোসেন।
* নীতি বিজ্ঞান ও মানবজীবন, ড. আমিনুল ইসলাম।
* সরকার পরিচিতি, ল্যারী ইলোয়িজ/অনুবাদ–সাইদুর রহমান।
* আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা, রোল্যান্ড ই.উইলসলে অনুদিত আশফাক উল আলম।
* সাংবাদিকতা ও জনযোগাযোগ, মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী।
* সত্যের সন্ধানে প্রতিবেদন ও অন্যান্য, ঢাকা-২০০০,রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ।
* সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বনাম সাংবাদিকতা-২০০০, সন্তোষগুপ্ত।
* গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯৪, আলী রিয়াজ।
* Leading Issues in Economic Development, G.M. Meier
* সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নাজমীনুর বেগম।
* পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন এ্যাকাডেমীর বার্ষিক জার্নাল, জুলাই ২০০১ (আষাঢ় শ্রাবণ ১৪০৮) সংখ্যা।
* Michel P. Todaro, Economic Development in the third world (New York : Longman Inc. 1983)
* দরিদ্রের জন্য পুঁজিবাদ ঃ গণতন্ত্রের জন্য পুঁজিবাদ-মাইকেল নোভাক।